আল্লামা শিবলী নো'মানী

আওরঙ্গজেব ঃ চরিত্র-বিচার

হাসান আলী

অনূদিত

বাংলা একাডেমী ঃ ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
মে, ১৯৬৯

পাণ্ডুলিপি : অনুবাদ বিভাগ

মুদ্রিত কপি : ২২৫০

প্রকাশক
আল-কামাল আবদুল ওহাব
পরিচালক
প্রকাশন বিক্রয় বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রক
জাহানারা খাতুন
মতি আর্ট প্রেস
৬, গোবিন্দ দাস লেন
আরমানিটোলা, ঢাকা-১

প্রচ্ছদ : সৈয়দ আমির হোসেন

মুদ্রণ তত্ত্বাবধায়ক
মোঃ আখতারুজ্জামান ভুইয়া

AURANGAZEB : CHARITRA BICHAR

সূচীপত্র

আওরঙ্গজেব আলমগীর

ইতিহাস দর্শনের একটা রহস্য এই যে, যে সকল ঘটনা যত বেশী প্রচারলাভ করে তাদের সত্যতা ততই সংশয়জনক হয়ে পড়ে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যেতে পারে—হাসির দেওয়াল, বাবেলের কূপ, আবে হায়াত, যাহ্‌হাকের সর্প এবং জমশেদের ভাণ্ড ইত্যাদির মত কোন বিষয়ই বোধ হয় সাধারণ্যে অধিকতর প্রসারলাভ করেনি। কিন্তু এদের একটারও মূলে কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে কি? অর্থাৎ অধিকাংশ ব্যাপারই বিশেষ কোন সাময়িক কারণে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তারপর গতানুগতিকতার প্রভাবে তার বহুল প্রচার ঘটে এবং তার প্রতি লোকে আস্থা স্থাপন করতে আরম্ভ করে। এমনকি তখন আর সত্যাসত্য অনুসন্ধান করবার প্রয়োজনও বোধ করে না। ফলে, ধীরে ধীরে তা সর্ববাদীসম্মত হয়ে পড়ে।

হজরত উমর ফারুক (রাঃ কর্তৃক আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরী পুড়িয়ে ফেলবার আদেশ প্রদান কোন বিদ্বেষপরায়ণ খ্রীস্টানেরই স্বকপোলকল্পিত প্রচারণা ছিল। এটা ঐ সময়ের কথা যখন ক্রুসেডের যুদ্ধ চলছিল এবং খ্রীস্টানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচারকল্পে নানারকম ফন্দী-ফিকির এঁটে বেড়াচ্ছিল। ব্যাপার এতদূর গড়াল যে, এ সংবাদ তাদের কানে পৌঁছামাত্র ছোট-বড়, বিদ্বান-মূর্খ, ভদ্র-অভদ্র এবং সাধু-অসাধু নির্বিশেষে সকলেই ঐ একই সুরে সুর মিলিয়ে গাইতে লাগল,—যেন খোদাতায়ালার বিশেষ দূত এসে তাদের প্রত্যেকের কানে কানে বলে গেল। ফলে বক্তৃতা, লেখনী, কিংবদন্তী, কাহিনী ও গল্প কোন কিছুর হাত থেকেই এ খবর রেহাই পায় নাই। অবশেষে সত্যানুসন্ধানের বিচারকক্ষ ঘোষণা করল,

"গোটা পৃথিবীটাই আমাদের বিরুদ্ধ-প্রচারণা ক্ষেত্রে পরিণত হয়ে গিয়েছে, সুতরাং সেখানে আমাদের স্থান কোথায়!"

আলমগীরের দুর্ণামের কাহিনীও উল্লেখিত ঘটনাপেক্ষা কোন অংশেই কম নয়। তাঁর প্রতি আরোপিত অপরাধের তালিকা এত সুদীর্ঘ যে,

সম্ভবতঃ আর কোন ব্যক্তিরই অপরাধ তালিকা এত বিরাট নয়। তিনি পিতাকে বন্দী করেছেন, ভাইদের হত্যা করেছেন, দাক্ষিণাত্যের ইসলামী রাষ্ট্রের বিলোপ ঘটিয়েছেন, হিন্দুদের নির্যাতন করেছেন, প্রতিমালয় ভেঙ্গে দিয়েছেন এবং মারহাট্টাদের উত্তেজিত করে তৈমুরী রাষ্ট্রের ভিত্তি-কাঠামো প্রকম্পিত করে তুলেছিলেন। অন্যান্য সকল প্রশ্ন ছেড়ে দিয়ে প্রথমতঃ চিন্তা করে দেখা যাক ঐ বংশেরই শ্রেষ্ঠতম ন্যায়পরায়ণ বাদশার প্রতি এই সকল প্রায় একই রকম অভিযোগ আরোপিত হতে পারে কিনা। যিনি পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রদের নিধন-সাধন,[১] দাক্ষিণাত্যের ইসলামী রাজ্য নিজামশাহীর বিলোপসাধন এবং এক বছরের ভিতরে ৬৫টি মন্দির বিধ্বস্ত করেছিলেন,[২] কিন্তু তা সত্ত্বেও আজীবন এতে গৌরব অনুভব করেছেন,—তিনি কে? তিনি হচ্ছেন দ্বিতীয় তৈমুর (ছাহেব কেরানে ছানি) শা'জাহান।

আমি এ নীতি অজ্ঞাত নই যে, এক ব্যক্তি দোষী প্রমাণিত হলে আর এক ব্যক্তি তাতে নির্দোষ সাব্যস্ত হয় না, অর্থাৎ শা'জাহান দোষী সাব্যস্ত হলে আলমগীরকে নির্দোষ বলা যেতে পারে না। কিন্তু বিশেষভাবে চিন্তা করে দেখবার বিষয় এই যে, শা'জাহানের যে দোষগুলো কারও কানেই পৌঁছেনি, আলমগীরের বেলায় সেই দোষগুলোই পথেঘাটে, সভা-সমিতিতে সর্বসাধারণের আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে পড়েছে। এর কারণ কি?

(মজনুর কলঙ্ক কাহিনী রটে গিয়েছে অনেক বেশী, অন্যথায় উভয়েরই পানপাত্র একই সৌধের চূড়া থেকে পতিত হয়েছে।)

১. শা'জাহানের ভ্রাতা শাহরিয়ার এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র তথা দানিয়েলের পুত্রদ্বয় তাহমুরাস ও হুশেং স্বয়ং শা'জাহানের আদেশে নিহত হয়। এদের হত্যা সাধনকল্পে শা'জাহান স্বহস্তে যে ফরমান লিখে পাঠিয়েছিলেন তার ভাষা ছিল এইরূপঃ

"সমগ্র সাম্রাজ্যের পরিস্থিতি যখন সঙ্কটময়, তখন দাওয়ার বখ্‌শ ও ভ্রাতা সাহরিয়ার এবং শাহজাদা দানিয়েলের পুত্রদ্বয়কে যদি এই ধরাধাম থেকে নিশ্চিহ্ন করে তাদের সিংহাসন দখল করবার লালসা ও ষড়যন্ত্রকে চিরতরে স্তব্ধিত করে দেওয়া যায়, তা অধিকতর কল্যাণকর হবে।"

(জাহাঙ্গীরের আত্মচরিতের পরিশিষ্ট, আলীগড়ী ছাপা, পৃঃ ৪৩৫) ২২শে জমাদিউল আউয়াল, ১৩৩৭ হিজরীতে এই আদেশ যথারীতি প্রতিপালিত হয়।

২. এই ঘটনাটা আবদুল হামিদ লাহোরী তাঁর 'শা'জাহান নামায়' বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন।

এই রহস্যের দ্বারোদ্ঘাটন করা যদিও একটা ঐতিহাসিক কর্তব্য, তথাপি জাতীয় বিচ্ছিন্নতার প্রশ্ন যেহেতু এখানে প্রচ্ছন্ন, সেহেতু আমি এর আলোচনা পরিহার করছি।

আলমগীরের বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ তালিকায় হায়দ্রাবাদ রাজ্যের নির্মূল সাধনই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। নানা কারণেই এর গুরুত্ব অনেক। নিম্নের অভিযোগ দুটা বিশ্লেষণ করে দেখা যাক :

(১) হায়দরাবাদ একটা শিয়া রাজ্য ছিল। কাজেই এর ধ্বংস সাধনে আলমগীরের একটা গুরুতর ধর্মীয় বিদ্বেষ প্রমাণিত হয়।

(২) হায়দ্রাবাদ বিধ্বস্ত হওয়ার ফলে মারহাট্টাদের শক্তি বেড়ে গেল। অতএব এটা একটা রাজনৈতিক অপরাধও বটে।

কাজেই আমি সর্বপ্রথম এই ঘটনার তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হচ্ছি।

দাক্ষিণাত্যে গোলকুণ্ডা, বিজাপুর, খান্দেশ, বেরার ও আহমদনগর—এই ৫টা রাজ্য ছিল। এই রাজ্যগুলো পরস্পর ঝগড়া ও কলহে লিপ্ত থাকত। সে কারণে পরিস্থিতি অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়ল। আলী আদেল শাহ হুসায়েন নেজামশাহের বাড়াবাড়িতে উত্যক্ত হয়ে পড়লেন এবং তাঁর সাহায্যের জন্য রামরাজকে আহ্বান করলেন। এই আহ্বানকালে যদিও শর্ত ছিল যে, হিন্দুরা মুসলমানদের ধন-প্রাণের কোন ক্ষতি করবে না, তা' সত্ত্বেও তারা আহমদনগরে এসে যে কার্যকলাপ প্রদর্শন করেছিল তা' ঐতিহাসিক ফেরেশতার ভাষায় নিম্নরূপ :

"মসজিদগুলোতে প্রবেশ করে তারা মূর্তিপূজা করত এবং বাদ্য বাজিয়ে গান গাইত। এই সংবাদ শ্রবণে বাদশাহ মর্মাহত হতেন; কিন্তু প্রতিকারের ক্ষমতা না থাকায় সমস্ত জেনেশুনেও না জানার ভাণ করতেন।"

এই ধরনের গৃহবিবাদের ফলে তৈমুরীদের হস্তক্ষেপ করবার সুযোগ ঘটে গেল। সর্বপ্রথম আকবর কয়েকটা রাজ্য অধিকার করে নিলেন। জাহাঙ্গীর ও শা'জাহান এই সকল রাষ্ট্রের সঙ্গে মিত্রতা সম্পর্ক রক্ষা করেই ব্যাপারটা শেষ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এই সমরসেবী পুরুষটা (আলী আদেল শাহ) অনন্যোপায় হয়ে যেমন বশ্যতা স্বীকার করতেন, তেমনি

সুযোগ পেলেই আবার শত্রুতা করতেন। সুতরাং বাধ্য হয়ে এই রাজ্য-গুলোর মূলোচ্ছেদ করে তৈমুরী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হল। আলমগীর যখন সিংহাসনে বসলেন, তখন হায়দরাবাদ ও বিজাপুর,—মাত্র এই দু'টো রাজ্য অবশিষ্ট ছিল।

এই সুযোগে শিবাজীর পিতা সাহু মাথাচাড়া দিয়ে উঠলেন। সাহু ও শিবাজীর বিস্তৃত কাহিনী এই প্রবন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

বর্ণনা প্রসঙ্গে এতটুকু স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে, বিজাপুরাধিপতি আদিল শাহ্ পুনা ও সুপা—এই দুটো সুবা সাহুকে জায়গীরস্বরূপ প্রদান করেছিলেন। এই সুযোগে শিবাজী ঐ সকল এলাকায় অনেকগুলো কেল্লা প্রস্তুত করে ফেললেন। আদিল শাহ্ পীড়িত হয়ে মারা গেলেন। তাঁর পীড়িতাবস্থায় শিবাজী তাঁর রাজ্যসীমা আরও বাড়িয়ে নিলেন এবং নিজস্ব এলাকার মধ্যে ৪০টা দুর্গ নির্মাণ করে ফেললেন। আদিল শা'র কোন শরায়ী উত্তরাধিকারী ছিল না। পারিষদবর্গ সেকেন্দার নামক একজন অজ্ঞাতকুলশীল ছেলেকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করলেন এবং তাঁকেই সিংহাসনে বসিয়ে দিলেন। তিনি যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হলেন তখন আফজাল খাঁকে শিবাজীর মুকাবেলা করার জন্য প্রেরণ করলেন। শিবাজী তাঁকে ধোকা দিয়ে হত্যা করে ফেললেন। এই সেকেন্দার আলমগীরের সমসাময়িক ছিলেন।

কিছুদিন পর শিবাজী মারা যান। তখন তাঁর পুত্র শম্ভু তার স্থান গ্রহণ করলেন। সেকেন্দার আপন দুর্বলতাবশতঃ অথবা তৈমুরীদের সঙ্গে পুরাতন খান্দানী শত্রুতাহেতু শম্ভুর সঙ্গে হাত মিলালেন এবং আলমগীরের বিরুদ্ধাচরণে তাঁকে সাহায্য করতে থাকলেন। এ ব্যাপারে আলমগীর তাঁকে বারবার সতর্ক করলেন। ভীতি ও সহানুভূতি প্রদর্শন ইত্যাদি সর্বপ্রকারে তাঁর চৈতন্য ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না।

খাফী খাঁ এ সম্পর্কে লিখছেন :

"যখন বিজাপুরাধিপতি সেকেন্দার শাহের, যিনি বিজাপুরের শাহের উত্তরাধিকারী না হয়েও শত্রুপক্ষের সঙ্গে মেলামেশা করতেন, বিবাদ

সৃষ্টি ও মতবিরোধের সংবাদ উপর্যুপরি সম্রাটের কর্ণগোচর হতে লাগল, তখন তিনি তাকে বারবার ভীতি, প্রতিশ্রুতি ও উপদেশমূলক ফরমানাদি প্রেরণ করলেন। কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হল না।"

অবশেষে বাধ্য হয়ে আলমগীর বিজাপুর অধিকার করলেন এবং আপন সাম্রাজ্যভুক্ত করে ফেললেন। কিন্তু সেকেন্দারকে যথোচিত ভদ্রতা ও সম্মান প্রদর্শন করলেন। তাঁকে 'সেকেন্দার খান' খেতাব দান করলেন। মুক্তাখচিত তরবারীসহ খাস খেলাত প্রদান করলেন। জমররাদ খচিত মুক্তা-মালাসহ ফুলের তোড়া দান করলেন। স্বর্ণখচিত পালক ও স্বর্ণমণ্ডিত যষ্টি উপহার দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আরও নির্দেশ দিলেন যে, স্বয়ং বাদশার তাঁবুর পার্শ্বেই যেন তাঁর তাঁবু স্থাপন করা হয় এবং প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্যাদি যেন শাহী খাজানা থেকে তাঁকে সরবরাহ করা হয়। (এর বিস্তৃত ব্যাখ্যা মুস্তায়েদ খাঁ সাকী কৃত 'আলমগীর নামা' দ্রষ্টব্য)।

আলমগীরের রাজত্বকালে হায়দরাবাদের শাসনকর্তা ছিলেন আবুল হাসান শাহ। তিনি জনসাধারণের নিকট 'তানা শাহ' নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর পূর্বে কুতুব শাহ ছিলেন সেখানকার শাসনকর্তা। তিনি যখন মৃত্যুমুখে পতিত হন, তখন তাঁর কোন পুত্র-সন্তান অথবা নিকট-আত্মীয়ও ছিল না। বাধ্য হয়ে দূরসম্পর্কীয় এক আত্মীয় আবুল হাসানকে সিংহাসনে বসান। এই আবুল হাসান বাল্যকাল থেকেই নপুংসদের সংসর্গে উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াতেন। সুতরাং সিংহাসনে উপবেশন করার পরেও ঐ অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটেনি। মাসেরুল উমারার গ্রন্থকার তাঁর খুবই অনুরক্ত ছিলেন। যেখানেই হায়দরাবাদের বিজয় কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়, সেখানেই তিনি ভাবে গদগদ হয়ে পড়েন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আবুল হাসানের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন :

"তেলেঙ্গনার অধিপতি আবুল হাসান চরম বিলাসিতার মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর পঞ্চদশ বর্ষীয় রাজত্বকালের ভিতরে হায়দ্রাবাদের বাইরে মুহাম্মদ নগর ও গোলকুণ্ডা ব্যতীত আর কোথায়ও ভ্রমণে বের হননি। উক্ত দু'টো স্থান হায়দ্রাবাদ থেকে মাত্র এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত ছিল। প্রত্যহ ভ্রমণে বহির্গত হওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন মনে হত।"(মাসেরুল

উমারা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬, জান সেপার খানের আলোচনা)।

আবুল হাসানের আরামপ্রিয়তা গোটা দেশটাকেই ঐ রঙ্গে রঙ্গীন করে তুলল। ফলে সর্বত্র প্রকাশ্যভাবে বিগর্হিত কার্যকলাপ ও মদ্যপান চলতে থাকল।

খাফী খাঁ লিখেছেন :

"হায়দ্রাবাদের শাসনকর্তা আবুল হাসান মাউনা ও আকনা নামক গুরুতর মুসলিমবিদ্বেষী কাফেরদ্বয়ের হস্তে রাজ্যের শাসনভার ন্যস্ত করলেন। ফলে মুসলমানদের উপরে অকথ্য অত্যাচার ও প্রকাশ্য নির্যাতন চলতে লাগল এবং পৈশাচিকতার নগ্নপ্রকাশ, মদ্যপান ও ক্রীড়া কৌতুকরূপে দেখা দিল। এই সংবাদ শাহানশাহের কর্ণগোচর হল।"

আবুল হাসান যাঁর সাহায্যে রাজত্ব লাভ করেছিলেন, তিনি সৈয়দ মুজাফফর নামক একজন উচ্চপদস্থ আমীর ছিলেন। আবুল হাসান তাঁকে পদচ্যুত করে মাউনা নামক একজন ব্রাহ্মণকে মন্ত্রীত্বের আসনে সমাসীন করলেন এবং রাষ্ট্র ও শাসনকার্যের সমস্ত ক্ষমতা তাঁর হস্তে অর্পণ করলেন। মাউনার এমন দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিল যে, আবুল হাসানের সেনাপতি ইবরাহিম খলীলুল্লাহ, যিনি একজন বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক ছিলেন, তাঁর অঙ্গুরীফলকে এই লাইনটা অঙ্কিত করে নিয়েছিলেন :

"বাদশাহ ও জ্ঞানবান পণ্ডিতের কৃপাদৃষ্টিতে ইবরাহিম খলীলুল্লাহ খাঁ সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব লাভ করেছেন।" (মাসেরুল উমারা, মহাবত খাঁ হায়দ্রাবাদীর আলোচনা প্রসঙ্গে, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৬৭-৬৯)।

মাউনার প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা সম্বন্ধে মাসেরুল উমারার গ্রন্থকার লিখেছেন :

"অভিশপ্ত ও ঘৃণিত উক্ত মাউনা ও আকনা নামক ব্রাহ্মণ ভ্রাতৃদ্বয়, যারা সমুদয় ফেৎনা ও ফসাদের মূল এবং উক্ত শাহী খান্দানের ধ্বংস ও পতনের কারণ, তাদেরই হস্তে রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক ভাঙ্গাগড়ার সমস্ত দায়িত্ব ন্যস্ত করা হল।" 'মাসেরুল উমারা', মহাবত খাঁ হায়দ্রাবাদীর আলোচনা প্রসঙ্গে)।

এটা ঐ সময়ের কথা যখন শিবাজী আলমগীরের দরবার থেকে পলায়ন করে দাক্ষিণাত্যে উপনীত হয়। হায়দ্রাবাদ এসে সে আবুল হাসানের সঙ্গে

পরামর্শ করে, তারা উভয়ে মিলে শাহী সাম্রাজ্যের উপরে আক্রমণ চালাবে। তদনুসারে আবুল হাসান সৈন্য ও অর্থ দিয়ে তাকে সাহায্য করেন। এরই ফলে আলমগীরের রাজত্বকাল যখন ২১ বছর, শিবাজী তৈমুরী রাজ্যের সীমান্তে প্রবেশ করে ও জালিনা পরগণার ধ্বংস সাধন করে। মাসেরুল উমারা গ্রন্থে এই ঘটনার প্রদত্ত বিস্তৃত বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

"পুত্র হায়দ্রাবাদাধিপতির সঙ্গে একমত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে, তারা উভয়ে মিলিতভাবে সম্রাটের সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করবে এবং প্রথমতঃ তারুদমন দুর্গ অধিকারে রওয়ানা হবে। এই উপলক্ষে তাঁর (আবুল হাসানের) নিকট থেকে সৈন্য ও অর্থ সাহায্য পেয়ে সে তাঞ্জোরে উপনীত হল। এই বৎসরেই শিবাজী শাহী সাম্রাজ্য আক্রমণ করে জালিনা পরগণাটাকে ধ্বংস করে দিল।" ('মাসেরুল উমারা', ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৪৫-৪৯)।

শিবাজীর মৃত্যুর পর শম্ভু যখন পিতার স্থান গ্রহণ করল, আবুল হাসান তাকেও আলমগীরের বিরুদ্ধে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে থাকলেন। তিনি একলক্ষ হুন (এক প্রকার স্বর্ণমুদ্রা) তার সাহায্যের জন্য প্রেরণ করলেন। এ সম্পর্কে খাফী খাঁ লিখছেন ঃ

"এ ছাড়াও তিনি শম্ভুকে জাহাঙ্গামী ও দারুল হরবী রাজ্য লুণ্ঠন ও দুর্গাদি অধিকার কাজে সাহায্য করেন এবং একলক্ষ হুনমুদ্রা প্রেরণ করে আবুল হাসান আপন নাম ও সম্মানের উপর সারাদেশব্যাপী কলঙ্ক লেপন করলেন।"

সর্বোপরি মজার ব্যাপার এই যে, আলমগীর যখন বিজাপুরের অবরোধ নিয়ে ব্যস্ত তখন আবুল হাসান তাঁর এক সেনানায়ককে লিখেছিলেন যে, একদিকে শম্ভা অসংখ্য সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন অন্যদিকে তিনি ৪০ হাজার দুর্ধর্ষ সৈন্য প্রেরণ করেছেন। তিনি দেখবেন, হজরত আমলগীর কয়দিক তাল সামলাতে পারেন। আবুল হাসানের পত্রের নকলসহ সমস্ত ঐতিহাসিকেরাই এই ঘটনাটা তুলে ধরেছেন। মাসেরুল উমরার গ্রন্থকার লিখেছেন ঃ

"এই অভিযান যখন দীর্ঘস্থায়ী হয়ে চলল, তখন দিগ্বিজয়ী সম্রাট প্রয়োজনবোধে আওরঙ্গাবাদ থেকে আহমদনগর ও সেখান থেকে শোলাপুরে

ছাউনী স্থানান্তরিত করলেন। ঐ সময়ে হঠাৎ আবুল হাসানের একখানা পত্র, যা তিনি তাঁর প্রহরীর নামে প্রেরণ করেছিলেন,—হুবহু সম্রাটের হস্তগত হয়। তাতে লেখা ছিল :

"এযাবত আমরা তাঁকে (বাদশাহকে) যথারীতি সম্মান প্রদর্শন করে এসেছি, অথচ তিনি সেকেন্দারকে এতিম ও দুর্বল বুঝতে পেরে বিজাপুর অবরোধ করেছেন এবং তাঁকে কাহিল করে ফেলেছেন। বিধায় আমাদের এখন কর্তব্য, বিজাপুরের বিরাট বাহিনী সত্ত্বেও রাজা শম্ভা বিপুল-সংখ্যক সৈন্য নিয়ে বাকশুনের দিক থেকে ঐ অসহায় ব্যক্তিটার সাহায্য-কল্পে কোমর বেঁধে অগ্রসর হবেন এবং আমি খলীলুল্লাহ খাঁ সিংহের সেনাপতিত্বে ৪০ সহস্র দুর্ধর্ষ অশ্বারোহী সৈন্যের একটা দল প্রেরণ করব। দেখব, তিনি কয়দিক সংগ্রাম চালাতে পারেন"। (মাসেরুল উমারা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৬৭-২৬৯)।

আলমগীর এই পত্র পাঠ করে বললেন. "আমি এতদিনও এই বাঁদর-নাচনেওয়ালাটাকে মুক্ত রেখেছিলাম। কিন্তু মুরগী যখন নিজেই চেঁচাতে শুরু করেছে তখন আর বাকী থাকল কি?"

তা সত্ত্বেও আলমগীরের নির্দেশে শাহজাদা মোয়াজ্জম শাহ যখন হায়দ্রাবাদ অভিযানে রওয়ানা হন, তখন তিনি আবুল হাসানকে লিখলেন যে, তিনি যদি নিম্নলিখিত শর্তগুলি গ্রহণ করেন, তাহলে তাঁকে ক্ষমা করবার জন্য সম্রাট সমীপে সুপারিশ প্রেরণ করা যেতে পারে :

১। মাউনাকে মন্ত্রিত্ব থেকে অপসারণ করা হোক এবং বন্দী করা হোক,
২। সিরাম ও রায়গড় প্রভৃতি পরগণাগুলি যা সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল এবং বলপূর্বক দখল করা হয়েছে, তা প্রত্যর্পণ করা হোক,
৩। পূর্ব ধার্যকৃত উপঢৌকনগুলোর অবশিষ্টাংশ অবিলম্বে প্রদান করা হোক।

কিন্তু আবুল হাসান সভাসদবর্গের কুপরামর্শে ঐ সকল শর্ত গ্রহণ করেননি। খাফী খাঁ লিখছেন :

"শাহজাদা মোয়াজ্জম যতদূর সম্ভব যুদ্ধ এড়িয়ে যাবার চেষ্টায় খলীলুল্লাহ খাঁকে সংবাদ প্রেরণ করলেন,

(১) যদি আবুল হাসান ত্রুটী স্বীকার করেন, ক্ষমা প্রার্থনা করেন, রাজ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে মাউনা ও আকনার হস্তক্ষেপকে রোধ করেন এবং তাহাদিগকে বন্দী করেন ;

(২) সিরাম ও রায়গড় প্রভৃতি পরগণাগুলো যা জবরদস্তি দখল করা হয়েছে, সম্রাটের অধীনস্থ শাসনকর্তাদের হস্তে প্রত্যার্পণ করেন ; এবং

(৩) পূর্ব স্থিরিকৃত উপঢৌকনগুলোর অবশিষ্টাংশ অবিলম্বে ও নিঃসঙ্কোচে শাহীদরবারে প্রেরণ করেন, তা' হলে তাঁকে ক্ষমা করবার জন্য শাহানশাহের দরবারে সুপারিশ করা যেতে পারে।

কিন্তু দাক্ষিণাত্যের নির্বোধ আমীরের দল দর্পভরে বাজে কৈফিয়ত দিয়ে বসলেন। শাহানশাহের ক্রোধ প্রশমনের কোন চেষ্টাই তাঁরা করলেন না।"

এরপর শাহজাদা মোয়াজ্জম আর একবার শুধুমাত্র সিরাম প্রভৃত পরগণাগুলো ফিরিয়ে দেওয়ার শর্তে আপোষের আলোচনা চালালেন। কিন্তু উত্তর এল,

"সিরাম আমার বর্শার অগ্রভাগের সঙ্গে গ্রথিত রয়েছে।" (খাফী খাঁ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩০২)।

এখন বিচার করুন, যেখানে শাসনকর্তার শৃঙ্খলা রক্ষা করার যোগ্যতা নেই, বেশ্যাবৃত্তি এবং বিলাসিতা রাজদরবার থেকে আরম্ভ করে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে, প্রধানমন্ত্রী এবং সভাষদবর্গ সকলেই হিন্দু যারা মুসলমান-দেরকে পদদলিত করে চলেছে, মারহাট্টাদেরকে সৈন্য ও অর্থ সাহায্য দিয়ে তৈমুরী রাষ্ট্রের বিলোপ ঘটাবার চেষ্টা চলছে এবং সম্রাটের এলাকায় লুটপাট অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সেমতাবস্থায় আকবর কেন, নওশেরোঁয়া বা উমর এবনে আবদুল আজিজও যদি হতেন কি করতেন? তাই করতেন, যা আজকের ইতিহাসে অভিযুক্ত আলমগীর করেছেন।

আক্রান্ত হয়ে আবুল হাসান যখন তাঁর চিরাচরিত অভ্যাসমত ক্ষমা প্রার্থনা করে দরখাস্ত পেশ করলেন, তখন আলমগীর এই আদেশ লিখলেন :

"যদিও ঐ দুষ্ট গ্রহটার বিগর্হিত কার্যকলাপ লেখনীর সীমা লঙ্ঘন করে গিয়েছে, তবুও সামান্য যা কিছু এখানে গণনা করা যেতে

পারে সেগুলো হল, যথাক্রমে, রাষ্ট্রের পরিচালনভার কাফের, দুশ্চরিত্র ও জালেমদের হস্তে ন্যস্ত করা ; সৈয়দবৃন্দ, বিজ্ঞ ও পণ্ডিতমণ্ডলীকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করা ; বর্বরতা ও পৈশাচিকতাকে অবারিত ও প্রকাশ্য-ভাবে চালু করার চেষ্টা করা ; নিজেও মাদকদ্রব্য সেবন ও লাম্পট্য ইত্যাদি নানাপ্রকার গুনাহে-কাবিরায় নিশিদিন নিমগ্ন থাকা ; অধিকন্তু কুফর ও ইসলামের মধ্যে, জুলুম ও ইনসাফের মধ্যে এবং পৈশাচিকতা ও ইবাদতের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য রক্ষা না করা ; দারুল হরবের কাফেরদের নিরবধি সাহায্য প্রচেষ্টায় অটল থাকা ; খোদাতায়ালার আদেশ ও নিষেধাবলী স্বয়ং মেনে না চলা, বিশেষতঃ নিষিদ্ধ মাসে এবং দারুল হরবীদেরকে সাহায্য করা, যা নিষেধ ক'রে কোরআনে মজিদে বিশেষভাবে আয়াত নাজেল হয়ে গিয়েছে এবং এইভাবে মানুষ ও খোদাপাক উভয়ের নিকটেই ঘৃণিত হওয়া। এ সম্পর্কে বারবার উপদেশমূলক ও সতর্কতামূলক ফরমান সম্রাট কর্তৃক জারি করা হলেও তাঁর (আবুল হাসানের) কর্ণকুহর থেকে উদাসীনতার তুলিকা নিক্ষিপ্ত হয়নি। বরং সম্প্রতি দুষ্ট শম্ভুকে একলক্ষ হুন প্রেরণ করা হয়েছে—এ সংবাদ শাহানশাহের কর্ণগোচর হয়েছে। তা' সত্ত্বেও দাম্ভিকতা ও মাদকতায় বিভোর থাকা ও স্বীয় জঘন্য কার্যকলাপের প্রতি দৃষ্টিপাত না করা, অথচ ইহকাল ও পরকালের মুক্তির আশা করা যেমনই অযৌক্তিক তেমই আকাশকুসুম চিন্তা।" (খাফী খাঁ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩০২)।

এই কথাগুলো মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করুন, বারবার পাঠ করুন এবং বিচার করে দেখুন—এদের একটা শব্দও বাস্তবতা ও সত্যতার অধিকার থেকে একটুও স্থানচ্যুত হয়েছে কি ? অথচ আশ্চর্যের বিষয়, এহেন কেলেঙ্কারী সত্ত্বেও নেয়ামত খাঁ আলী, মাসেরুল উমারার গ্রন্থকার খাফী খাঁ প্রমুখের মতে হায়দ্রাবাদের দিকে দৃষ্টিপাত করাও পাপ। তাঁদের মতে, হায়দ্রাবাদ আক্রমণের চিন্তা করতেও আলমগীরের বিবেক কেঁপে উঠত। তিনি ঐ আক্রমণ মানসে শায়খুল ইসলামের নিকট ফতোয়া তলব করেন। কিন্তু শায়খুল ইসলাম তাতে অসম্মত হন এবং অবশেষে পদত্যাগ করেন। ('মাসেরুল উমারা,' কাজী আবদুল উয়াবের আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

অনন্যোপায় হয়ে আলমগীর মির্জা মোহাম্মদকে দূতরূপে আবুল হাসানের নিকট প্রেরণ করেন। তাঁকে কানে কানে বলে দেন, তিনি যেন আবুল হাসানের সঙ্গে আলোচনায় এরূপ বাড়াবাড়ি করেন, যাতে প্রত্যুত্তরে আবুল হাসানও ঔদ্ধত্য দেখাতে বাধ্য হন এবং তার ফলে হায়দ্রাবাদ আগমণের একটা উপলক্ষ হয় (খাফী খাঁ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৯৪)। যুদ্ধ বাধাবার উদ্দেশ্যে তিনি আবুল হাসানের নিকট এমন একটা মূল্যবান হীরা দাবী করেন যা দিতে তিনি কুণ্ঠাবোধ করেন।

এই সকল ঐতিহাসিকদের জ্ঞানগরিমার প্রতি লক্ষ্য করুন, একাধারে মারাঠাদের ষড়যন্ত্র, শাহী অধিকৃত অঞ্চলে অন্যায় হস্তক্ষেপ, হিন্দুদের প্রভুত্ব, রাষ্ট্রীয় বিশৃংখলা, লাম্পট্য ও পৈশাচিকতার তাণ্ডবলীলা এবং মুসলমানদের লাঞ্ছনা ও অবমাননা ইত্যাদি কেলেঙ্কারীগুলো হায়দ্রাবাদ আক্রমণের পক্ষে যথেষ্ট কারণ নয়; বরং দূতের সঙ্গে বাড়াবাড়ি এবং মূল্যবান রত্নের দাবী গৃহীত না হওয়াই এরূপ গুরুতর অপরাধ, যাতে আলমগীর অবলীলাক্রমে হায়দ্রাবাদ আক্রমণ করতে পারেন এবং তার জন্য কেউ তাঁকে দোষারোপ করতে না পারেন।

আবদুল কাদের বদায়ুনী সমালোচনাসহ আকবর সম্পর্কিত সত্য সত্য কতকগুলো ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু জাহাঙ্গীর তাঁর রাজত্বকালে ঐগুলোর প্রচার ও প্রকাশ একদম বন্ধ করে দেন। কিন্তু নেয়ামত খাঁ আলী বিরচিত 'অকায়েয়ে নেয়ামত' নামক গ্রন্থখানি যদিও আদ্যোপান্ত আলমগীরের গালিগালাজে ভর্তি, তথাপি আলমগীরের স্থলাভিষিক্ত বাহাদুর শাহ শিয়াপন্থী হওয়ার কারণে নেয়ামত খাঁকে 'দানেশমন্দ' খেতাব প্রদান করেন। পরিণামে ঐ গ্রন্থখানা পাঠ্যপুস্তকেও পরিণত হয়। সুতরাং বাহাদুর শাহের ন্যায় উত্তরাধিকারী, নেয়ামত খাঁ আলী, খাফী খাঁ এবং শাহনেওয়াজ খানদের ন্যায় ইতিহাস লেখকদের হাতে আলমগীরের পক্ষে সুনামের কি আশা থাকতে পারে? তা' সত্ত্বেও এই ঈর্ষাকাতর ঐতিহাসিক সত্যকে ঢেকে রাখতে পারেননি। বরং তাঁর নিজস্ব স্বীকৃত ঘটনাবলীই প্রমাণ করে দিল যে, হায়দ্রাবাদের ধ্বংস সাধন প্রকৃতপক্ষে কোন ইসলামী রাষ্ট্রের নয় বরং একটা মারাঠী রাষ্ট্রের ধ্বংস সাধনই ছিল।

আমি আমার কতিপয় শিয়া বন্ধুকে এও বলতে শুনেছি যে, আলমগীর স্বয়ং তাঁর রাষ্ট্রের পতন ঘটিয়েছেন। কারণ দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রগুলো মারাঠাদের দাবিয়ে রেখেছিল। তাদের দমন যখন উঠে গেল তারা তখন শক্তিশালী হয়ে উঠল, কিন্তু বন্ধুরা অবগত নন যে, দাক্ষিণাত্যের ঐ সকল রাজ্য মারাঠাদের করদ-রাজ্যে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। (মস্তায়েদ খাঁ সাকী আলমগীর নামায় বিজাপুরাধিপতির অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন, "পরাজিত, ঘৃণিত কাফের ও বিধর্মী শত্রুর সঙ্গী ও সহচর হয়ে পড়েছিল", হায়দ্রাবাদাধিপতি আবুল হাসানেরও অবস্থা ঠিক এই ছিল)। আলমগীর যদি হায়দ্রাবাদ ও বিজাপুর অধিকার না করতেন তা হলে বরোদা ও গোয়ালিয়রের ন্যায় হায়দ্রাবাদ ও বিজাপুরেও (ইসলামী পতাকার স্থলে) আজ মারাঠী পতাকাই উড়তে থাকত।

আওরঙ্গজেব আলমগীর ও মারাঠাগণ

আলমগীরের প্রতি আরোপিত অভিযোগাবলীর এটা দ্বিতীয় প্রস্থ তালিকা এবং বস্তুতঃ এটা কতকগুলো অভিযোগের সমষ্টি। এর বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ :

(১) স্বয়ং আলমগীরের পক্ষ থেকেই মারহাট্টা কলহের সূত্রপাত হয়।

(২) শিবাজী আলমগীরের দরবারে উপস্থিত হলে তিনি এরূপ ব্যবহার দেখিয়েছিলেন যে, শিবাজী ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বিদ্রোহ করতে বাধ্য হন। তিনি যদি উদারতা প্রদর্শন করতেন, তাহলে হয়ত বা শিবাজী তাঁর তাঁবেদার হয়ে পড়তেন।

(৩) শিবাজীকে আলমগীর অভয় দিয়েই ডেকেছিলেন, কিন্তু প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে আটক করে ফেললেন।

(৪) শিবাজীর স্থলাভিষিক্তদের সঙ্গে আলমগীর সদ্ব্যবহার করেননি।

(৫) আলমগীর মারাঠাদেরকে দমন করতে পারেননি। বরং তারাই তৈমুরী রাষ্ট্রকে ওলটপালট করে দিয়েছিল। সুতরাং তৈমুরী রাষ্ট্রের পতনের মূল কারণ আলমগীর স্বয়ং। এ সকল প্রশ্ন মীমাংসা করবার পূর্বে আমি শিবাজী বংশের গোড়ার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করছি। এর ফলে মতানৈক্যপূর্ণ প্রশ্নগুলির মীমাংসাকল্পে ভবিষ্যতে সুবিধা হতে পারে।

শিবাজীর বংশ

(শিবাজীর বংশ-পরিচয় খাফী খাঁ তাঁর ইতিহাসে ২য় খণ্ড ১১১ পৃষ্ঠায় কলকাতায় ছাপা এবং গোলাম আলী আজাদ তাঁর 'খাজানায়ে আমেরা' গ্রন্থে ৩৯ পৃষ্ঠায় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। কিন্তু অধিকতর বিস্তৃত ও বিশ্বস্ত বর্ণনা মাসেরুল উমারা গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে। যেহেতু শিবাজীর পৌত্র সাহু আলমগীরের দরবারে সাত হাজারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেজন্য মাসেরুল উমারা গ্রন্থে তাঁর ইতিহাস একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধরূপে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে মাত্র এবং সঙ্গে সঙ্গে উক্ত বংশের প্রাথমিক অবস্থাও নিতান্ত বিস্তারিতভাবে লিখেছেন। আমিও অধিকাংশ তথ্য তাঁদের ঐ গ্রন্থসমূহ থেকেই সংগ্রহ করেছি।)

শিবাজীর বংশ প্রকৃতপক্ষে উদয়পুরের মহারাণার সঙ্গে সম্পর্কিত। এই বংশের সুরসেন নামক এক ব্যক্তি চিতোর পরিত্যাগ করে দাক্ষিণাত্যের করকম্ব পরগণার পরনিদা জেলায় চলে আসেন। তাঁর বংশের জনৈক মালবাজী স্থানীয় অধিবাসীদের উপর ক্ষুন্ন হয়ে দৌলতাবাদের নিকটবর্তী এলোরা নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেন। এই সময়ে দৌলতাবাদ নিজামশাহী বংশের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করছিল। এখানকার দেশমুখ অর্থাৎ তহশীলদার লক্ষ্মীযাদু নামক এক ব্যক্তি ছিলেন। মালবাজী এই লক্ষ্মীযাদুর অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। তাঁর (মালবাজীর) দুই পুত্র ছিল। যেহেতু তিনি আহমদনগরে সমাধিস্থ শাহ শরীফ সাহেবের অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন, তাই স্বীয় পুত্রদ্বয়ের নাম শাহ সাহেবের নামানুসারে শাহ্জী ও শরফজী রেখেছিলেন। এই শাহ্জী উত্তরকালে সাহুজী নামে পরিচিত হন এবং ইনিই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ শিবাজীর পিতা। লক্ষ্মীযাদুর একটি মাত্র কন্যা ব্যতীত আর কোন সন্তানাদি ছিল না। সাহুজী যেহেতু অনিন্দ্যসুন্দর যুবক ছিলেন, লক্ষ্মীযাদু তাঁকে স্বীয় পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল তাঁর কন্যাকে তিনি সাহুজীর সঙ্গে বিয়ে দেবেন। কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁর (যাদুর) আত্মীয়স্বজনগণ তাঁকে বাধা প্রধান করে। অবশেষে মালবাজী অনঙ্গপাল নামক একজন নামকরা জমিদারের দরবারে প্রবেশলাভ করেন এবং লক্ষ্মীযাদুকে বাধ্য ক'রে তাঁর পুত্রের সঙ্গে যাদুর কন্যার বিয়ে সম্পাদন করেন।

সাহুজী

সাহুজী সর্বপ্রথম নিজামশাহী দরবারের নৈকট্য লাভ করলেন। হিজরী ১০৩০ সালে যখন নিজাম শাহের সৈন্যগণ নর্বদা (নর্মদা) পার হয়ে মালোয়া লুণ্ঠন করল এবং তাদের প্রতিরোধের জন্য জাহাঙ্গীর সৈন্য সমাবেশ করলেন, তখন নিজাম শাহের সেনানায়কদের মধ্যে সাহুজী ও তাঁর শ্বশুর যাদুরায়কেও দেখা গিয়েছিল। (খাফী খাঁ, ১ম খণ্ড, ৩১৮ পৃষ্ঠা ও মাসেরুল উমারা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৩০)। জাহাঙ্গীর যখন ওর প্রতিশোধ গ্রহণকল্পে শাহজাহানকে দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করলেন, তখন যাদুরায় শাজাহানের খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং আনুগত্য স্বীকারের বিনিময়ে পাঁচহাজারী মনসব প্রাপ্ত হলেন। তাঁর বংশেরও সকলেই শ্রেণীমত চাকুরী পেয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি পুনরায় বিদ্রোহ করে ১০৪০ হিজরীতে নিজাম শাহের নিকট ফিরে গেলেন। নিজাম শাহ্ তাঁকে হত্যা করে ফেললেন। ফলে সাহুজী নিজাম শাহের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে শাহজাহানের দরবারে চলে এলেন এবং পাঁচহাজারী মনসবে অধিষ্ঠিত হলেন। অধিকন্তু অস্ত্রের খেলাত, স্বর্ণখচিত পতাকা, নাকাড়া, ঘোড়া, হাতী এবং দুই লক্ষ টাকা উপঢৌকনস্বরূপ পেয়ে গেলেন। সাহুজীর শ্যালকদ্বয় বাহাদুর ও জগদেবও যথাক্রমে পাঁচহাজারী ও চারহাজারী মনসব লাভ করলেন। (খাফী খাঁ, পৃঃ ৪২৮)। শা'জাহান নিজাম শাহের কতিপয় এলাকা, যা আম্বরের জায়গীরস্বরূপ ছিল তা সাহুজীকে প্রদান করলেন। কিন্তু ১০৪১ হিজরীতে আম্বরের পুত্র ফতে খাঁ যখন নিজাম শাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে শাহজাহানের দরবারে চলে এলেন তখন শা'জাহান আম্বরের এলাকাগুলি সাহুজীর নিকট থেকে নিয়ে ফতে খাঁকে প্রত্যর্পণ করলেন। এই কারণে সাহুজী ক্ষুণ্ণ হয়ে বিজাপুরাধিপতি আদেল শাহের সঙ্গে মিলিত হলেন এবং একটা উৎকৃষ্ট সৈন্যবাহিনীসহ দৌলতাবাদের দিকে অগ্রসর হ'লেন। (খাফী খাঁ, ৪৭৬ পৃষ্ঠা, মাসেরুল উমারা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫২০ ও ৫২২)।

সাহুর চৈতন্যবোধের জন্য শা'জাহান সৈন্য প্রেরণ করলেন। ঐ সনেই তাঁর সন্তান-সন্ততিগণও গ্রেফতার হয়। হিজরী ১০৪২ সনে সাহুজী জফরা নগর আক্রমণ করলেন। হিজরী ১০৪৪ সনে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে অন্যান্য

জেলার লুণ্ঠনকার্য আরম্ভ করে দিলেন। এরই প্রতিশোধ নেবার জন্য আওরঙ্গজেব আলমগীর আদিষ্ট হলেন।

শা'জাহান নিজাম শাহকে গ্রেফতার ক'রে বন্দী করলেন। নিজাম নিঃসন্তান ছিলেন। বিধায় সাহজী একজন অজ্ঞাতকুলশীল ছেলেকে নিজামের উত্তরাধিকারী সাজিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে দিলেন এবং এই সুযোগে তৈমুরী রাষ্ট্রের কতিপয় জেলা অধিকার করে নিলেন। (খাফী খাঁ, পৃঃ ৫২০)। সাহজীর এই বাড়াবাড়ির ব্যাপারে বিজাপুরাধিপতি আদিল শাহ্‌ও বরাবর তার সঙ্গে ছিলেন। তিনি যে সাহজীর সাহায্যকল্পে রন্দুলাকে সৈন্যবাহিনীসহ প্রেরণ করেছিলেন প্রমাণস্বরূপ তা বলা যেতে পারে। (সিয়ারুল মুতায়াক্ষেরীন, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১৪ ও ১১৮।)

এই বাড়াবাড়ি এমন চরমে পৌঁছে গিয়েছিল যে, শা'জাহান বিপুল বিক্রমে এর মূলোচ্ছেদনকল্পে দৃঢ়সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি হিজরী ১০৪৫ সন মোতাবেক নবম রাজ্যাভিষেক বর্ষে বড় বড় আমীরগণের সেনাপতিত্বে ৪৮ হাজার সৈন্য দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করলেন। তন্মধ্যে সরদার খান জমানকে ২০ হাজার সৈন্যের সেনাপতি নিযুক্ত করে নির্দেশ দিলেন যে, সাহর আশ্রয়স্থল চামারকুণ্ড ধ্বংস করে দিয়ে কোকেনের জেলাগুলোর দিকে তিনি যেন ধাবিত হন। ফলে খান জমান তাঁর সৈন্যদলসহ সাহর ২৫টা দুর্গ অধিকার করে নিলেন এবং তাকে বিজাপুর পর্যন্ত তাড়িয়ে দিলেন। হিজরীর ১০৪৬ সনে সাহ নিজামশাহীর রাজ্য থেকেও বিতাড়িত হল। (হালাতে শাহ্‌জাহান, খাফী খাঁ প্রণীত, পৃঃ ৫২০, ৫২১, ৫৩৯)।

অতঃপর সাহজী আদিল শাহের দরবারে চাকরী গ্রহণ করলেন। তিনি তাঁকে পুনা ও সুপা জায়গীরস্বরূপ প্রদান করলেন। শিবাজী এখন যৌবনপ্রাপ্ত। শৌর্যবীর্যের পরিচয় প্রদান করতেও আরম্ভ করেছেন; ঐ জেলাগুলোর শাসনকার্যের দায়িত্ব তিনি স্বহস্তে গ্রহণ করলেন এবং স্থানে স্থানে দুর্গ নির্মাণকার্য আরম্ভ করে দিলেন। মাসেরুল উমারার বর্ণনা মতে ধীরে ধীরে তিনি ১৫ হাজার সৈন্যের একটা বিরাট বাহিনী গড়ে তুললেন এবং আপন শাসনাধীন এলাকার সীমা আরও বাড়িয়ে নিতে লাগলেন। ইতিমধ্যে আদেল শাহ্ পীড়িত হওয়ায় তাঁর দরবারে অত্যন্ত বিপর্যয় দেখা দিল। এই সুযোগে শিবাজী

আশেপাশের অঞ্চলসমূহে দৌরাত্ম্য চালাতে লাগলেন। দূরবর্তী এলাকাগুলো পর্যন্ত তিনি করায়ত্ত করে ফেললেন। অত্যল্প কালের মধ্যেই কোকেনের সমগ্র এলাকা যা বিজাপুরের শাসনাধীনে ছিল তা গ্রাস করে ফেললেন। (খাফী খাঁ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১ হইতে ১৮ পৃঃ)। শিবাজী শক্তি সঞ্চয় করে এই পথ অবলম্বন করলেন যে, যে শহর বা যে পল্লীই বসতিপূর্ণ ও বর্ধিষ্ণু, তাতেই তিনি নৈশ আক্রমণ চালাতে লাগলেন এবং লুণ্ঠন করতে লাগলেন। স্থানীয় শাসনকর্তাগণ যখনই এই বিষয় আদেল শাহের কর্ণগোচর করত সঙ্গে সঙ্গেই শিবাজীর দরখাস্ত পৌঁছে যেত। দরখাস্ত করে তিনি জানাতেন যে, সেখানকার আয় অনেক পরিমাণে বাড়ানো যেতে পারে এবং এই আয় বাড়ানোর শর্তেই ঐ জেলাগুলো জায়গীরস্বরূপ তাঁকে প্রদান করা হোক। আদিল শাহের অসুস্থতাবশতঃ দরবারে বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছিল। সুতরাং জায়গীরদারদের লেখালেখির প্রতি কোন মনোযোগই প্রদর্শন করা হত না (খাফী খাঁ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১৪ ও ১১৫) বরং ঘুষখোর কর্মচারীরা শিবাজীকে জায়গীরের সনদ অবলীলাক্রমে লিখে পাঠিয়ে দিত।

ইতিমধ্যে, অর্থাৎ ১০৬৬ হিজরী, মুতাবেক ৩০শে রাজ্যাভিষেক বর্ষে আদিল শাহ্ মৃত্যুমুখে পতিত হন। যেহেতু তাঁর কোন পুত্রসন্তান ছিল না, সভাষদবর্গ এক অজ্ঞাত কুলশীল বালককে যিনি আলী আদেল শাহ্ নামে পরিচিত, তাঁকে সিংহাসনে সমাসীন করে দিলেন। শা'জাহান এই সংবাদ পাইয়া বিজপুর অধিকারকল্পে আলমগীরকে নির্দেশ প্রেরণ করলেন। (খাফী খাঁ, ২য় খণ্ড, ৪৫৪ পৃষ্ঠা)। আলমগীর বিজাপুর অবরোধ করে বসলেন। বাধ্য হয়ে আলী আদেল শাহ এক কোটি টাকা নজরানা প্রদান করতে স্বীকৃত হলেন। ঠিক এই মুহূর্তে শা'জাহান পীড়িত হয়ে পড়লেন। দারাশেকো তখন যুবরাজ হওয়ার দাবী নিয়ে সাম্রাজ্যের বল্গা স্বহস্তে ধারণ করলেন। যেহেতু সর্বপ্রথম আলমগীরের শক্তি খর্ব করাই প্রয়োজন ছিল, সেজন্য আলমগীরের সঙ্গে যে সকল আমীর-ওমরাহ্ ও সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন, তাঁদেরকে দারাশেকো রাজধানীতে ফিরে আসবার নির্দেশ দিলেন। আলমগীর উপায়ান্তরবিহীন হয়ে অবরোধ প্রত্যাহার করলেন এবং আওরঙ্গাবাদে ফিরে এলেন। (খাফী খাঁ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৫৭)।

পরিস্থিতি যখন এইরূপ, অর্থাৎ শা'জাহান পীড়িত ও ক্ষমতাচ্যুত, দারা-শেকো ভাইদের মূলোৎপাটন চিন্তায় ব্যস্ত, মুরাদ নিজ নামে গুজরাটে মুদ্রা ও খোৎবা জারি করেছেন, সুজা সিংহাসনের মোহে বাংলা থেকে রাজধানীর পথে ধাবিত হয়েছেন এবং আলমগীর দাক্ষিণাত্য থেকে বহির্গত হয়ে পড়েছেন, তখন শিবাজীর পক্ষে খেলা দেখাবার ইহাপেক্ষা বড় সুযোগ আর কি হতে পারে? তিনি চতুর্দিকে অরাজকতা সৃষ্টি করতে আরম্ভ করলেন। অধিকন্তু ৪০টা দুর্গ নির্মাণ করলেন। দ্বীপাঞ্চলে সামুদ্রিক শক্তির আয়োজন করলেন (খাফী খাঁ, ২য় খণ্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা)। মারাঠাদের একটা বিরাট সেনাবাহিনী গড়ে তুললেন। এইভাবে তিনি ধীরে ধীরে বিজাপুরের অধিকাংশ জেলাগুলোর উপরই আধিপত্য বিস্তার করে বসলেন। কবিতায় আছে,

পুষ্প চয়নকারীর নির্মমহস্ত যখন সমগ্র পুষ্পরাজির হত্যা সাধনে ব্যস্ত,
বাগানের মালী তখন বাগানের আঙ্গিনায় ঘুমের নেশায় বিভোর।

আলী আদেল শাহের যখন ঘুম ভাঙ্গলো তখন তিনি তাঁর সেনাপতি আফজাল খাঁকে শিবাজীর সমাধি রচনা করবার জন্য প্রেরণ করলেন। আফজাল খাঁ তাঁকে অবরুদ্ধ করে ফেললেন। নিরুপায় হয়ে শিবাজী ছলনা ও প্রতারণার সাহায্যে উদ্ধার পাবার চেষ্টা করল।

খাফী খাঁ লিখছেন :

"আফজাল খাঁ একজন যোগ্য আমীর ও সার্থক বীর। তাঁর নিকট (শিবাজী) পৌঁছুবার পর তিনি তাঁর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন করে ফেললেন। কিন্তু ঐ কলহপ্রিয় কুকুরটা যখন বুঝতে পারল যে, যুদ্ধের কাতারে দাঁড়িয়ে অথবা অবরুদ্ধ হয়ে তার বাঁচবার উপায় নেই, তখন ছলনা, প্রতারণা ও শৃগালের ন্যায় ফন্দী এঁটে একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তির মধ্যস্থতায় স্বকীয় অপরাধের জন্য লজ্জিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করল।"

'মাসেরে আলমগীরি'তে বর্ণিত আছে :

আদেল খাঁ যখন শিবার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করতে মনস্থ করলেন, তখন উপযাচক হয়ে শিবাজী তাঁর অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। তিনি লিখে জানালেন, আফজাল খাঁকে প্রেরণ করুন, আমি তাঁর সঙ্গে এসে সামনাসামনি আমার সমস্ত বক্তব্য পেশ করব।" মোটকথা, আফজল খাঁ দুই সহস্র সৈন্য

নিয়ে যাত্রা করলেন। পরস্পর সাক্ষাতের শর্ত সাব্যস্ত হ'ল—সাক্ষাৎকালে কারও সঙ্গে অস্ত্র থাকবে না। সুতরাং আফজাল খাঁ অস্ত্রশূন্য ছিলেন; কিন্তু শিবাজী ক্ষুদ্র একখানা ছোরা আস্তিনের ভিতরে লুকিয়ে রেখেছিল। কোলাকুলি মুহূর্তে তিনি আফজাল খাঁর কাজ করে দিলেন।

আলমগীরের সৈন্য চালনা

এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে শিবাজী তৈমুরী সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরেও লুটপাট ও অরাজকতা শুরু করে দিলেন। আলমগীর তখনও রাজত্বপিয়াসীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে মুক্ত হননি, তথাপি তৃতীয় রাজ্যাভিষেক বর্ষে হিজরী ১০৭০ সনের জমাদিউল আওয়াল মাসে আমীরুল উমারা শায়েস্তা খাঁকে এই অশান্তি দমনকল্পে দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করলেন। হিজরীর ঐ সনে আমীরুল উমারা যখন সেবাগ্রামে উপনীত হন, তখন শিবাজী সুপায় অবস্থান করছিলেন। আমীরুল উমারার আগমনবার্তা শ্রবণ মাত্র সেখান থেকে পলায়ন করলেন। তখন অবিলম্বে তিনি সুপা দখল করে নিলেন। ধীরে ধীরে পুনা ও সেবাপুরও তাঁর করতলগত হয়ে গেল। এরপর তিনি জালিনা অবরোধ করলেন এবং কয়েক মাস পর অবরোধবাসিগণ নিরাপত্তার প্রার্থনা জানিয়ে তাঁর হস্তে দুর্গ সমর্পণ করল। ('মাসেরে আলমগীরি'র গ্রন্থকার ও খাফী খাঁ এই সকল ঘটনা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন)। আমীরুল উমারা পুনরায় সদর দফতর স্থাপন ক'রে শিবাজীর নির্মিত নিজস্ব মহলে বাস করতে লাগলেন। শিবাজীর অনুসন্ধানে তিনি চতুর্দিক সৈন্য প্রেরণ করলেন। শিবাজী তখন স্থান থেকে স্থানান্তরে পলায়ন করে ফিরছিলেন। এমনকি দুর্গম গিরিকন্দরেও দুই-এক সপ্তাহের অধিক অবস্থান করতে পারেনি। খাফী খাঁ লিখছেন:

"শিবাজী ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে এমনই হীনবল হয়ে পড়েছিলেন যে, দুর্গম পর্বতাঞ্চলেও সপ্তাহে সপ্তাহে ও মাসে মাসে স্থান পরিবর্তন করে ফিরছিলেন।" (২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭২)।

শিবাজী তার সেই পুরানো চাল চালতে লাগলেন। হিজরী ১০৭৩ সন মোতাবেক ৬ষ্ঠ রাজ্যাভিষেক বর্ষে আমীরুল উমারার উপর নৈশ আক্রমণ করে বসলেন। যেহেতু তাঁর অসাবধানতার কারণেই শিবাজীর পক্ষে এই সুযোগ ঘটে গেল। তাই আলমগীর তাঁকে অপসারিত করে শাহজাদা মোয়াজ্জমকে ঐ কাজে নিযুক্ত করলেন।

শিবাজীর বাড়াবাড়ি আরও বেড়ে গেল। সুরাটের নিকটবর্তী যে বন্দরগুলো ছিল অর্থাৎ জিউল ও পায়েল প্রভৃতি দখল করে নিল এবং নিত্যনৈমিত্তিক লুণ্ঠনকার্যাদির সঙ্গে সঙ্গে হাজীদের জাহাজগুলোও লুণ্ঠন করতে আরম্ভ করলেন। (খাফী খাঁ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭৭)। আলমগীর মহারাজা জয়সিংকে, যিনি জয়পুর রাজ্যের রাজা এবং সেনাপতির মনসাবে বরিত ছিলেন, তাঁকে এই অভিযানে নিযুক্ত করলেন। তাঁর সৈন্যবাহিনীর অগ্রদূতরূপে (হেরাল্ড) দিলীর খাঁকে নিয়োগ করলেন। জয়সিং ১০৭৫ হিজরী, মোতাবেক ৮ম রাজ্যাভিষেক বর্ষে পুনায় প্রবেশ করলেন। তারপর চতুর্দিক সৈন্য প্রেরণ করলেন। দিলীর খাঁ ৭ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে ৫ মাসের মধ্যে শিবাজীর অধিকৃত সমগ্র অঞ্চল ধ্বংস করে ফেললেন। শিবাজীর নিজস্ব রাজধানী রাজগড় ছিল। তাঁর মাতৃকুলের সকলেই কান্দানায় বাস করতেন। তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারলেন যে, যদি এই স্থানগুলোও হাতছাড়া হয়ে যায়, তাহ'লে তার সন্তান-সন্ততি সকলেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কোন উপায় না দেখে তিনি বশ্যতা স্বীকার করতে প্রস্তুত হলেন।

এ সম্পর্কে খাফী খাঁ লিখছেন :

সংক্ষেপে বর্ণনা এই যে, দুর্গ আক্রমণকারী বীর যোদ্ধাগণের চেষ্টার ফলে অবরুদ্ধদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ল। তাদের পলায়নের পথ চতুর্দিক থেকে এমনভাবে রুদ্ধ হয়ে গেল যে, ঐ ফন্দীবাজ যত উদ্যমই করুক না কেন, তাঁর বংশের নরনারীদেরকে ওখান থেকে বের করবার অন্য কোন দুর্গম স্থানে স্থানান্তরিত করবার এবং আপন সৈন্যবাহিনীকে শত্রুসৈন্যের পশ্চাদ্ধাবনে প্রেরণ করবার কোন উপায়ই খুঁজে পেলেন না। আরও বুঝতে পারলেন যে, তার আশ্রয়স্থান রাজধানীর দুর্গটাও যদি অধিকৃত হয়ে যায়, তাহলে তাঁর কৃত অপরাধের কবলে পতিত হয়ে সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে। সুতরাং তিনি কতিপয় জ্ঞানী ব্যক্তিকে তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করবার জন্য রাজা জয়সিংহের নিকট প্রেরণ করলেন। তারা কতিপয় দুর্গ যা তখনও শিবাজীর অধিকারে ছিল তা সমর্পণ করবেন এবং রাজাজীর সঙ্গে শিবাজীর সাক্ষাৎ ঘটাবার চেষ্টা করবেন। (খাফী খাঁ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৮০ ও ১৮১)।

"মাসেরুল উমারা'তে লিখিত আছে যে, যখন অবরুদ্ধ রুদ্রমল দুর্গে তোপ দাগিয়ে একটা বুরুজ উড়িয়ে দেওয়া হল তখন দিলীর খাঁ দুর্গের বুরুজের উপর তাঁর সৈন্য চড়িয়ে দিলেন। শিবাজী যখন দেখতে পেলেন যে, তার সমস্ত পরিবারবর্গ যে পুরন্দর দুর্গে অবরুদ্ধ, তারও পতন ঘটে যাচ্ছে, তখন বাধ্য হয়ে তিনি আপোষের দরখাস্ত পেশ করলেন। (মাসেরুল উমারা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫০ ও ৫১, তাজকেরায়ে দিলীর খাঁ)। কিন্তু কপট শিবাজীর উক্তির প্রতি রাজা জয়সিংহের কোনই আস্থা না থাকায় তিনি আক্রমণ ও যুদ্ধায়োজন আরও বৃদ্ধি করবার নির্দেশ প্রদান করলেন। ইতিমধ্যে সংবাদ পৌঁছুল যে, শিবাজী দুর্গ থেকে নিরস্ত্র অবস্থায় বেরিয়ে পড়েছেন। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই তার কতিপয় বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণ এসে পড়লেন এবং রাজাজীর নিকটে বাষ্পরুদ্ধ লোচনে মিনতি জানিয়ে দৃঢ় শপথ গ্রহণ করলেন। খাফী খাঁ লিখছেন :

"রাজাজী শিবাজীর ছলনা ও প্রতারণার কথা চিন্তা করে পূর্বাপেক্ষ অধিক শক্তিতে আক্রমণের জন্য তাগিদ দিলেন। ইত্যবসরে খবর এল যে, শিবাজী দুর্গ থেকে নিরস্ত্র অবস্থায় বেরিয়ে পড়েছেন। সঙ্গে সঙ্গেই তার কতিপয় বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণ এসে পৌঁছলেন এবং তারা নিতান্ত বিনয়সহকারে ও অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে কঠিন শপথ গ্রহণ করলেন।"

ফলকথা, রাজা জয়সিং যখন নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারলেন যে, শিবাজী নতিস্বীকার করেই তাঁর নিকট আসছেন, তখন তাকে সাক্ষাৎ করবার অনুমতি প্রদান করলেন এবং তাঁর মুনশী আদিবরাজকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য প্রেরণ করলেন। কিন্তু শিবাজী থেকে সতর্ক থাকবার জন্য কতিপয় অস্ত্রধারী রাজপুতকেও সঙ্গে দিলেন; এটুকুও বলে দিলেন, 'যদি তিনি অকপটভাবে আসেন তাহলে নিরস্ত্র অবস্থায় আসুন, অন্যথায় ফিরে চলে যান।' (খাফী খাঁ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৮১)। অস্ত্রহীন অবস্থায় আসবার এই শর্ত 'মাসেরে আলমগীররি'তে উল্লিখিত আছে)।

শিবাজী অস্ত্রহীন অবস্থায় এসে হাজির হলেন। জয়সিং সৌজন্য প্রদর্শন করে তাকে আলিঙ্গন করলেন। শিবাজী করজোড়ে মিনতি জানালেন (খাফী খাঁ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮২) "একজন নগণ্য গোলামের ন্যায় অপরাধীরূপে হাজির হয়েছি। এখন আপনার ইচ্ছা, হত্যা করুন বা মুক্তি দিন।" খাফী খাঁর বর্ণনা নিম্নরূপ :

"নগণ্য দাসগণের ন্যায় অপরাধীরূপে হুজুরের দরগায় হাজির হয়েছি। এখন ক্ষমা করা বা হত্যা করা আপনার ইচ্ছা।"

শিবাজী প্রার্থনা জানালেন, বড় বড় সমস্ত দুর্গগুলোই হুজুরের খেদমতে সমর্পণ করছি, "শুধু আবেদন যে, আমার পুত্র শম্ভুকে রাজকর্মচারীরূপে গ্রহণ করে নিন। আমি নিজে কোন দুর্গে নির্জনবাস করব। যদি কখনও অধমের প্রয়োজন হয়, অবিলম্বে তাতে সাড়া দেব।" জয়সিং তাকে অভয় দিলেন এবং অবরোধ প্রত্যাহার করার জন্য দিলীর খাঁকে খবর পাঠালেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ৭ হাজার নরনারী ঐ সকল দুর্গ থেকে বেরিয়ে এলেন এবং তাদের সকলকেই নিরাপত্তার আশ্বাস প্রদান করা হল। দিলীর খাঁ তাঁর পক্ষ থেকে তরবারী, ছোরা, ২টা আরবী ঘোড়া ও সোনালী সাজসরঞ্জাম শিবাজীকে উপহার দিলেন। অধিকন্তু জয়সিংহের হাতে শিবাজীর হাত মিলিয়ে দিলেন। জয়সিং নিজেও খেলাত, ঘোড়া ও হাতী প্রদান করলেন। দিলীর খাঁ স্বহস্তে শিবাজীর কটিদেশে তরবারী পরিয়ে দিলেন। কিন্তু শিবাজী কিছুক্ষণ পরেই ওটা খুলে রেখে দিলেন এবং বললেন যে, বিনা অস্ত্রেই তিনি সেবাকার্য সমাধা করে যাবেন।

ইতিপূর্বেই জয়সিং শিবাজীকে ক্ষমা করবার জন্য শাহীদরবারে সুপারিশ পাঠিয়েছিলেন। তার ফলে সেখান থেকে খেলাত ও আদেশ এসে পড়ল। শিবাজাকে প্রথমতঃ খেলাত ও ফরমান গ্রহণ করবার আদব-কায়দা শিক্ষা দেওয়া হল। সুতরাং ফরমানের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন হেতু শিবাজী ৩ মাইল পথ পদব্রজে অতিক্রম করলেন এবং খেলাতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। (এর পূর্ণ বিবরণ খাফী খাঁ প্রণীত গ্রন্থে দ্রষ্টব্য)।

শিবাজী ৩৫টি দুর্গের মধ্যে ২২টি দুর্গই রাজকর্মচারীদের হস্তে সমর্পণ করলেন। তাঁর পুত্র শম্ভার জন্য রাজা জয়সিং ৫ হাজারী মনসবের যে সুপারিশ প্রেরণ করেছিলেন, যথারীতি তা গৃহীত হয় এবং শম্ভুকে শাহী ফরমান প্রদান করা হয়। হিজরী ১০৭৫ সনের জিলহজ্ব মাসের ৭ই তারিখে শিবাজী জয়সিংহের খেদমতে হাজির হয়েছিলেন। তখন থেকে তিনি এ পর্যন্ত তলোয়ার ধারণ করেননি। কিন্তু ২৬শে রবিউস সাউয়ালে অর্থাৎ প্রায় ৪ মাস পরে জয়সিং তাকে অস্ত্র ধারণ করবার অনুমতি দিলেন এবং স্বর্ণমণ্ডিত তরবারি উপহার দিলেন।

এ প্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, আলমগীর যখন শিবাজীর মূলোৎপাটনকল্পে জয়সিংকে প্রেরণ করেছিলেন, তখন আদিল শাহকেও শিবাজীর বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আদিল শাহ্ বাহ্যতঃ এই নির্দেশ পালন করেছিলেন বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি শিবাজীকে হাতে রাখার প্রয়োজনই অনুভব করছিলেন। সুতরাং গোপনে তিনি শিবাজীকে সকল রকম সাহায্যই প্রদান করে আসছিলেন। অধিকন্তু হায়দ্রাবাদাধিপতি কুতুব শাহকেও তিনি এই মর্মে অনুরোধ জ্ঞাপন করেছিলেন। 'মাসেরে আলমগীরি'তে এই ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে। তার বর্ণনা নিম্নরূপ :

"শাহী ফরমান মারফত আদিল শাহকে নির্দেশ প্রদান করা হ'ল যে, তিনিও যেন তাঁর সৈন্সদল ঐ দুর্বৃত্তটার বিরুদ্ধে সন্নিবেশ করেন। বাহ্যতঃ যদিও তিনি শাহানশাহের আদেশ পালনে সচেষ্ট ছিলেন এবং তাঁর সৈন্যবাহিনীর একটা বিরাট অংশকে উক্ত নীচাশয়ের রাজ্যসীমায় নিয়োজিতও করেছিলেন, কিন্তু তথাপি ঐ দুরাচার ও দুষ্টগ্রহটার সমূলে উচ্ছেদ সাধন আপন রাজনৈতিক স্বার্থের প্রতিকূল মনে করেছিলেন এবং ঐ দুষ্টটাকে শাহানশাহের সৈন্সবাহিনী ও বিজাপুরাধিপতির মধ্যে কণ্টকস্বরূপ জিইয়ে রাখাই সঙ্গত বোধ করেছিলেন। সুতরাং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আদেল শাহ্ তার (শিবাজীর) সঙ্গে চিঠিপত্র ও সংবাদাদি প্রেরণ এবং প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার পালনে একমত ও একতাবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। ফলে তাঁর মর্যাদা রক্ষার্থে গোপনে তাঁকে জায়গীর প্রদান ও টাকা-পয়সা প্রেরণ ইত্যাদি যা কিছু প্রয়োজন সর্বোতভাবে সাহায্য করছিলেন। মনে মনে শঙ্কিত হয়ে ও উল্লিখিত প্রয়োজনে হায়দ্রাবাদাধিপতি কুতুবুল মুলক্‌কেও এ ব্যাপারে উত্তেজিত করে তুলেছিলেন।" ('মাসেরে আলমগীরি', পৃঃ ৯১২ ও ৯১৩)।

এই সকল অঘটন ঘটার পরেও আলমগীরের বিজাপুর ও হাদ্রাবাদ আক্রমণকে অন্যায় ও অযৌক্তিক বলা যেতে পারে কি? হঠাৎ মধ্যখানে এই প্রশ্নের অবতারণা করা হল। পুনরায় আমি শিবাজীর প্রসঙ্গে ফিরে আসছি।

শিবাজী আনুগত্য স্বীকার করলেন এবং ২৩টা দুর্গের চাবি সমর্পণ করলেন। নবম রাজ্যাভিষেক মোতাবেক ১০৭৩ হিজরীতে তিনি রাজধানী আগ্রার পথে

অগ্রসর হলেন। শহরের নিকটবর্তী হতেই আলমগীর রাজা জয়সিংহের পুত্র কুমার রামসিং এবং মোখলেস খাঁকে শিবাজীর অভ্যর্থনার জন্য প্রেরণ করলেন। শিবাজী দরবারে উপনীত হয়ে যথারীতি অভিবাদন জ্ঞাপন করলেন ও নজরানা পেশ করলেন। আলমগীর তাঁকে ৫ হাজারী উমরাহদের দলভুক্ত করে নেবার কথা ইঙ্গিতে জানালেন। কিন্তু শিবাজীর আকাঙ্ক্ষা ইহাপেক্ষা উচ্চতর ছিল। তিনি এককোণে গিয়ে রামসিংহের নিকট আপত্তি জ্ঞাপন করলেন এবং পেটের বেদনার ভান করে সেখানেই বিছানার উপর শুয়ে পড়লেন। (মাসেরুল উমারা, তাজকেরায়ে রাজা সাহু)।

ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ ও তাদের অন্ধভক্তের দল আলমগীরের অদূরদর্শিতা ও ভ্রান্তনীতির যে স্মারকলিপি রচনা করেছেন, এখান থেকেই তার সূচনা। বোম্বাই-এর গভর্নর এলফিনিস্টন সাহেব লিখেছেন :

"আওরঙ্গজেবের পক্ষে এ সুযোগ ছিল যে, তিনি শিবাজীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করতেন এবং তাঁকে ভদ্র আচরণ প্রদর্শন করে তার কাছ থেকে উপকার প্রত্যাশা করতেন। কিন্তু যেমনই তাঁর গোঁড়ামীপূর্ণ ধর্মীয় ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেও ঠিক তেমনই অনুদার ও হীনমনা ছিলেন। ফলে, শিবাজীকে সহসা লাঞ্ছিত ও অপমানিত করা থেকে আত্মসংযম করেছিলেন বটে, কিন্তু নিজস্ব জাতবিদ্বেষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেননি। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, শিবাজী যখন দিল্লীর কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন, তখন জয়সিংহের পুত্র রামসিংহের সঙ্গে একজন নিম্নপদস্থ সরদারকে তার অভ্যর্থনার জন্য প্রেরণ করা হ'ল। যখন দরবারে হাজির হলেন তখনও তার বক্তব্য জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। তিনি যথারীতি শিষ্টাচার প্রদর্শন করে দরবারে উপঢৌকন প্রদান করেছিলেন। সম্ভবতঃ তারপর দরবারের রীতি অনুযায়ী গুণ-কীর্তনার্থ দুই-চারটা শব্দও ব্যবহার করতে এবং বিনয়ের সহিত সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হতে ইচ্ছাও পোষণ করেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি লক্ষ্য করলেন যে, বাদশাহ তার প্রতি মনোযোগ প্রদর্শন করলেন না এবং কোন বিচার-বিবেচনা না করে তাকে তৃতীয় পর্যায়ের সরদারদের দলভুক্ত করে দিলেন, তখন তিনি তার দুঃখ ও অভিমান সম্বরণ করতে পারেননি। ফলে ক্রোধে ও ক্ষোভে তার রং বদলে গেল।

সভাষদবর্গের দল থেকে তিনি দূরে সরে পড়লেন এবং বেহুঁশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। জ্ঞান যখন ফিরে এল তখন রামসিংকে তাঁর পিতার প্রবঞ্চনা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্য তিরস্কার করতে লাগলেন। অধিকন্তু ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে রাজকর্মচারীদের নিকট প্রার্থনা জানালেন যে, তার আবেদন-নিবেদন যেমন ধূলিসাৎ করে দেওয়া হয়েছে, তেমনিভাবে তাকেও ধূলিসাৎ করে দেওয়া হোক ; অর্থাৎ মান-সম্মানই যখন চলে গেল তখন আর প্রাণের মায়া করবার কি আছে?" (এলিফিনিস্টন সাহেবের ইতিহাসের অনুবাদ, আলীগড়ী ছাপা, পৃঃ ১০৫২ ও ১০৫৩)।

লেনপুল, ফারায়ের ও বার্নিয়ার প্রমুখ ইউরোপীয় গ্রন্থকারগণও প্রায় এই রকমই লিখেছেন। কোন কোন ইউরোপীয় ঐতিহাসিক এও লিখেছেন যে, এই ঘটনার পর আলমগীর শিবাজীকে বন্দী করলেন এবং তার উপর পাহারা বসিয়ে দিলেন। এই আলোচনার ব্যাখ্যাদান প্রসঙ্গে নিম্নের কয়েকটা প্রশ্ন বিবেচনা করা দরকার :

১। শিবাজীকে যে ব্যবহার দেখান হয়েছিল, তা কি তাকে উপেক্ষা ও ঘৃণা করার উদ্দেশ্যে ছিল ?

২। শিবাজীকে কি গ্রেফতার করা হয়েছিল ?

৩। শিবাজীকে যদি সৌজন্য প্রদর্শন করা হ'ত তা'হলেই কি তিনি ভক্ত ও অনুরক্ত হয়ে পড়তেন ?

৪। এই ঘটনা সম্পর্কে ইউরোপীয় ও মুসলমান ঐতিহাসিকগণের মধ্যে কাদের মতামত অধিকতর মূল্যবান ?

সমস্ত ঐতিহাসিকগণই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, শিবাজীকে অভ্যর্থনা করে আনবার জন্য রামসিং এবং মোখলেছ খাঁ প্রেরিত হয়েছিলেন। রামসিং রাজা জয়সিংহের পুত্র ছিলেন এবং আলমগীরের উমারাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ও একটা সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি ছিলেন। রামসিং শা'জাহানের ১৯তম অভিষেক বর্ষে ৫ শত অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে বাদশার দরবারে এসেছিলেন। তাঁকে তখন হাজারী মনসাব খেলাত প্রদান করা হয়েছিল। শাজাহানের ২৭তম অভিষেক বর্ষে তাঁর মনসাব সাড়ে তিন হাজারী পর্যন্ত পৌঁছেছিল। তিনি আলমগীরের একজন বিশ্বস্ত পাত্র ছিলেন। এমনকি

সোলায়মান শেকোয়াহকে আনার জন্য আলমগীর তাঁকেই রাজা জয়সিংহের স্থলাভিষিক্ত করে পাঠিয়েছিলেন। যেদিন শিবাজীর বশ্যতা স্বীকার করার সংবাদ পৌঁছল, আলমগীর রামসিংকে মণিমুক্তা খচিত গহনা, হাতী ও খেলাত প্রদান করলেন। (রামসিংহের বিস্তারিত ও স্বতন্ত্র আলোচনা তাজকেরায়ে মাসেরুল উমারায় দ্রষ্টব্য)। যেহেতু শিবাজী রাজা জয়সিংহের মধ্যস্থতায় ও তাঁরই জামিনে দরবারে প্রবেশলাভ করেছিলেন, সুতরাং তাঁর অভ্যর্থনার জন্য রামসিং অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি আর কে ছিলেন? রামসিং পিতার উপযুক্ত পুত্র ও তাঁর স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। মোখলেছ খাঁকে রামসিংহের সঙ্গে পাঠাইবার কারণ এই ছিল যে, একজন হিন্দু আগন্তুককে অভ্যর্থনা করে আনবার জন্য কোন মুসলিম সভাষদ প্রেরিত হননি, এ রকম অপবাদ যেন না দেয়া হয়।

এলফিনিস্টন সাহেবের চালাকি এখানে লক্ষ্য করবার বিষয়। তিনি অভ্যর্থনাকারিগণের মধ্যে মোখলেছ খাঁকে প্রধান ব্যক্তি ধরে নিয়েছেন এবং বলছেন যে, রামসিংকে তাঁর সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল। অথচ সমস্ত ইতিহাসেই রামসিংহের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে। শিবাজীকে যে মনসব প্রদান করা হয়েছিল সেটা ৫ হাজারী ছিল, এলফিনিস্টন সাহেব সেটাকে তাঁর পুস্তকের নোটে তৃতীয় পর্যায়ের মনসব বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এই নামকরা ঐতিহাসিক প্রবর অবগত নন যে, এই সময় পর্যন্ত স্বয়ং জয়সিংহেরও মনসব ৫ হাজারীর অধিক ছিল না। তাঁর বিরাট জয়লাভের বিনিময়ে যখন তাঁর মনসবে আরও ২ হাজার বাড়িয়ে দেওয়া হ'ল তখনই মাত্র তিনি ৭ হাজারী পদে উন্নীত হলেন। মাসেরে আলমগীরিতে লেখা আছে ঃ

> "জিলহজ্জ মাসের ১৯শে তারিখে পুরন্দর দুর্গের বিজয়বার্তা ও শিবাজীর আগমন সংবাদ শাহানশাহের কর্ণগোচর হ'ল। তখন তাঁর (জয়সিংহের) সৈন্যসংখ্যায় আরও দুই হাজার দ্রুতগামী অশ্বারোহী তাঁর অনুগামীরূপে যুক্ত করা হ'ল। ফলে আসল ও বর্ধিত সংখ্যার সমষ্টিতে তিনি অশ্বারোহীসহ ৭ হাজারী মনসবে উন্নীত হলেন।" ('আলমগীরনামা', কাজেম শিরাজী প্রণীত, পৃঃ ৯০৭)।

রাজা জয়সিং জয়পুর রাজ্যের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ও আলমগীরের দরবারের সর্বাপেক্ষা উচ্চপদস্থ সভাষদ ছিলেন। সর্বোপরি তিনি শিবাজী

বিজেতা ও তাঁর বিধ্বস্তকারী ছিলেন। আমাদের ইউরোপীয় বন্ধু কি মনে করেন যে, একজন বিজিত বিদ্রোহীকে একজন বিজয়ী শাসনকর্তার সমমর্যাদা দান করা যেতে পারে ?

শুধু রাজা জয়সিংহ পর্যন্তই এটা সীমাবদ্ধ ছিল না। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ফাজেল খাঁর পদমর্যাদাও ৫ হাজারীর অধিক ছিল না। এর চেয়েও উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা এই যে, উদয়পুরের মহারানা অপেক্ষা অধিকতর মর্যাদাসম্পন্ন আর কোন রাজা হিন্দুস্থানে ছিলেন না। কিন্তু এই মহারানার বংশও যখন শাহী-দরবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করলেন, তখন জাহাঙ্গীর রানাকরণকেও ৫ হাজারী মনসব প্রদান করেছিলেন। এরপর শাজাহান ১০২০ হিজরীতে রানা জগৎসিংকেও এই মনসব প্রদান করেছিলেন। তা'ছাড়া রানা রাজ-সিংহও আলমগীরের দরবার থেকে এই মনসবই লাভ করেছিলেন। রানা-করণের আলোচনা প্রসঙ্গে মাসেরুল উমারার গ্রন্থকার ধারাবাহিকভাবে মনসব সম্পর্কিত সমস্ত কাহিনী উল্লেখ করেছেন। তা'হলে শিবাজী কি উদয়পুরের মহারানাদের চেয়েও অধিকতর মর্যাদাশালী ছিলেন? এত সমস্ত ঘটনা বাদ দিলেও স্বয়ং শিবাজীর পিতা সাহজী তৃতীয় অভিষক বর্ষে যখন শাজাহানের দরবারে প্রবেশাধিকার লাভ করেন, তখন শাজাহান তাঁকেও এই ৫ হাজারী মনসব প্রদান করেছিলেন। (মাসেরুল উমারা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৪০)।

শিবাজী বশ্যতা স্বীকার করায় কি রাষ্ট্র অনুগৃহীত হয়েছিল ?

শাহী সৈন্যবাহিনী তার সমগ্র এলাকা দখল করে নিয়েছিল। দুর্গের ভিতরে চতুর্দিক থেকে তাকে ঘিরে ফেলা হয়েছিল। তার নিজস্ব কেন্দ্রীয় দুর্গগুলোর গম্বুজের উপরেও শাহী সৈন্যবৃন্দের পতাকা উড্ডীয়মান হয়েছিল। এই সকল বাধ্যতামূলক কারণেই অস্ত্র ত্যাগ করে তিনি ভৃত্যের ন্যায় এসে হাজির হয়ে-ছিলেন। তখন তাঁকে দরবারেও প্রেরণ করা হয়েছিল। এতদসত্ত্বেও আলমগীর তার অভ্যর্থনার জন্য দরবারের সর্বাপেক্ষা যোগ্যতম ব্যক্তি বলে যিনি বিবেচিত হতেন তাঁকেই প্রেরণ করেছিলেন এবং দরবারে ৫ হাজারী আমীরগণের দলে তাকে স্থান দান করে রাজা জয়সিংহের ন্যায় উচ্চপদস্থ ব্যক্তির মনসবভুক্ত করে দিয়েছিলেন। এরচেয়ে বেশী আর কি তার আশা করবার ছিল ? তাহ'লে কি ভারতসম্রাটের পক্ষে একজন পরাভূত দস্যুর জন্য সিংহাসন থেকে

নেমে এসে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা উচিত ছিল ? হাঁ, ইউরোপ সিংহাসনে এরূপ মিথ্যা ও কপটতামূলক অভিনয়ের যথেষ্ট নজির স্থাপন করতে পারে। কিন্তু ইসলামের নিকট এরূপ আশা করা বাঞ্ছনীয় নয়। মনসবের আলোচনা পরিহার করলেও শিবাজীকে যে সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছিল তার বিবরণ মাসেরে আলমগীরি গ্রন্থের নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি থেকে অবগত হওয়া যাবে।

"খলীফার দরগায় পৌঁছে তিনি দরবারের দ্বারদেশ চুম্বন করবার সৌভাগ্য লাভ করলেন। তারপর যথারীতি অভিবাদন জ্ঞাপন ক'রে হুজুরে ওয়ালার নির্দেশে নৈকট্য ও পদমর্যাদা পুনঃপ্রাপ্ত হল। এরপর যথাযোগ্য পদে, যা দরবারের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের জন্যই নির্ধারিত ছিল, বরিত হলেন। অতঃপর উল্লেখযোগ্য ও উচ্চপদস্থ উমারাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন।"

যে গ্রন্থের এই বর্ণনা, তা স্বয়ং আলমগীরের আদেশে দৈনন্দিন কার্যসূচীরূপে (ডায়রী) লিখিত হত এবং আলমগীরকে তার মুশাবিদা দেখিয়ে মঞ্জুরী নেওয়া হয়। সুতরাং বর্ণিত বাক্যগুলি প্রকারান্তরে স্বয়ং আলগীরেরই মুখনিঃসৃত বাণী। এই বর্ণনায় পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, শিবাজীকে দরবারে ঐ পদমর্যাদা প্রদান করা হয়েছিল যা শাহানশাহের নিকটবর্তী ও বিশিষ্ট মর্যাদাসম্পন্ন উমারাদের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। আলমগীর যদি শিবাজীকে উপেক্ষা করতেই চাইতেন, তা'হলে শিবাজীকে মর্যাদা দান ও সম্মান প্রদর্শন করা হ'ল বলে কেন তিনি তাঁর ডায়রীতে উল্লেখ করবেন ? দরবারের অনুষ্ঠানাদি যা কিছু সম্পন্ন হ'ত তা সাময়িক কার্যসূচী মাত্র এবং তা ঘণ্টা-দু'ঘণ্টার বেশী স্থায়ী হত না। কিন্তু ইতিহাস কেয়ামত পর্যন্ত স্থায়িত্ব লাভ করবে। শিবাজীকে অপমান করাই যদি আলমগীরের উদ্দেশ্য হ'ত তা'হলে ঘণ্টা-দু'ঘণ্টার জন্য তাকে লাঞ্ছিত করে অনন্তকালের জন্য ইতিহাসে 'সম্মানিত করা হল' বলে রেকর্ড করে রাখা কি তিনি পছন্দ করতেন ?

ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ ছাড়াও খাফী খাঁ শিবাজীর অসন্তোষের কারণগুলি নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন ঃ

১। ইতিপূর্বে শিবাজীর পুত্রকেও ৫ হাজারী মনসব প্রদান করা হয়েছিল। সুতরাং পুত্রাপেক্ষা পিতার মর্যাদা অধিকতর হওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল।

২। জয়সিং তাঁকে যে আশা-ভরসা দিয়েছিলেন, শাহানশাহের তরফ থেকে তা পূর্ণ করা হয় নাই।

৩। তাঁর আশানুরূপ অভ্যর্থনা তাঁকে জ্ঞাপন করা হয় নাই।

অভ্যর্থনা সম্পর্কে তো আমি পূর্বেই লিখেছি। অবশিষ্ট দুটি প্রশ্নের প্রতি দৃষ্টিপাত করা কর্তব্য।

আসল প্রশ্ন এই যে, রাজা জয়সিং শিবাজীর জন্য কি সুপারিশ করেছিলেন যার ভরসায় তিনি দরবারে হাজির হতে রাজী হয়েছিলেন? আলমগীর সে-সুপারিশকে মঞ্জুর করেছিলেন কিনা? যে আশা শিবাজীকে দেওয়া হয়েছিল, তা আলমগীরের পক্ষ থেকে পূর্ণ করা হয়েছিল কিনা?

সমস্ত ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে একমত যে, শিবাজী অসন্তুষ্ট হয়ে যখন দরবার ত্যাগ করলেন তখন আলমগীর আদেশ করলেন যে, রাজা জয়সিংকে আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা জ্ঞাপন করা হোক। সেখান থেকে যে রকম উত্তর আসবে, তদ্রূপ কাজ করা যাবে। খাফী খাঁ এ সম্পর্কে লিখছেন ঃ

"তিনি হুকুম দিলেন, রাজা জয়সিংকে প্রকৃত অবস্থা লেখা হোক। তিনি যা সঙ্গত বোধ করবেন তাই করা হবে এবং এর উত্তর না আসা পর্যন্ত শিবাজীর 'মুজরা'তে উপস্থিত হওয়া স্থগিত থাকবে।"

মাসেরে আলমগীরিতে আছে ঃ

"শাহী ফরমান মারফত এই কাহিনী রাজা জয়সিংকে জানানো হ'ল। তাঁর অভিমত চেয়ে পাঠান হল যে, তিনি যা সঙ্গত বোধ করবেন তাই যেন জ্ঞাপন করেন। তদনুসারে তার (শিবাজীর) প্রতি ব্যবহার প্রদর্শন করা হবে।"

রাজা জয়সিং যে উত্তর প্রেরণ করলেন তা' শুধু এইটুকু ছিল যে, তার অপরাধ মার্জনা করা হউক।

মাসেরে আলমগীরিতে লিখিত আছে,

"ইত্যবসরে রাজা জয়সিংহের নিবেদনপত্র এল, 'তার সঙ্গে আলোচনা করেছি। ঐ নীচাশয়টার অপরাধ মার্জনা করাই নানা কারণে অধিকতর সঙ্গত'।"

এই পত্র আসবার পর শিবাজীকে পাহারাধীন রাখবার যে আদেশ বলবৎ ছিল তা' প্রত্যাহার করা হ'ল এবং তাকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেওয়া হ'ল।

আমি বেনারসে একটি প্রসিদ্ধ কায়স্থ পরিবারে একটা হাতে লেখা পাণ্ডু-লিপি দেখেছি। তাতে রাজা জয়সিংহের ঐ সকল পত্রাবলী ছিল, যা তিনি শিবাজী এবং তাঁর যুদ্ধাদি সম্পর্কে আলমগীরকে লিখেছিলেন। তন্মধ্যে একখানা বিশেষ পত্র এই সকল ঘটনা সম্পর্কে লিখিত ছিল। এশীয় রীতি অনুসারে পত্রখানা সুদীর্ঘ ছিল। কিন্তু গোটা পত্রখানার মধ্যে কোথায়ও একথা লেখা ছিল না যে, তিনি শিবাজীকে ৭ হাজারী মনসবের প্রতিশ্রুতি দান করেছিলেন। অথবা এই ধরনের অন্য কোন আব্দারেরও উল্লেখ ছিল না। শুধু এইটুকু লেখা ছিল যে, তাঁকে যেন অভ্যর্থনা জানান হয়।

স্বপক্ষ ও বিপক্ষ উভয় ধরনের ঐতিহাসিকগণই লিখেছেন যে, রাজা জয়সিং শিবাজীর পুত্র শম্ভুজীর জন্য ৫ হাজারী মনসবের সুপারিশ করেছিলেন এবং তা মঞ্জুরও হয়েছিল। অনুরূপভাবে (শিবাজীর জামাতা ও সেনা-বাহিনীর নেতা) নেতুজীর জন্য রাজা জয়সিং ৫ হাজারী মনসবের সুপারিশ জানিয়েছিলেন এবং তাও গৃহীত হয়েছিল। এটা সর্ববাদীসম্মত যে, সম্ভুজী প্রমুখদের জন্য জয়সিংহের সুপারিশ পুরোপুরিভাবেই গৃহীত হয়েছিল। আরও সর্বস্বীকৃত যে, কোন ঐতিহাসিক আভাসে-ইঙ্গিতেও এরূপ দাবী করেন নাই যে, জয়সিং শিবাজীকে ৭ হাজারী মনসব প্রদানকল্পে কোনরূপ সুপারিশ করেছিলেন এবং এত সর্বজনবিদিত যে, এই ঘটনার পর আলমগীর যখন জয়সিংকে প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাপন করলেন ও এর প্রতিকার জানতে চাইলেন, তখন তিনি শুধুমাত্র অপরাধ মার্জনা ও আদর-আপ্যায়ন জানাবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। সুতরাং নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হচ্ছে যে, শিবাজীকে ৭ হাজারী ইত্যাদি কোন প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়নি। অথবা কোন কারণেই প্রতিশ্রুতিভঙ্গমূলক কোন কাজও করা হয়নি। এই সকল মূলীভূত কারণে দরবারে প্রদর্শিত শিবাজীর গোস্তাখী ক্ষমা করবার জন্য জয়সিং আবেদন জানিয়েছিলেন। সুতরাং শিবাজীকে কোতোয়ালীর প্রহরাধীন রাখার যে নির্দেশ দেওয়া ছিল তা প্রত্যাহৃত হয়েছিল।

খাফী খানের দাবী, শম্ভুজীকে যে মনসব প্রদান করা হয়েছিল, শিবাজীকে তদপেক্ষা অধিকতর উপযুক্ত মনসব প্রদান করা উচিত ছিল। আপাততঃ এটা দুঃখের বিষয় বটে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তৈমুরী রাজসভায় এরূপ

ঘটনা বিরল নয়, যেখানে পিতা ও পুত্রকে একই মর্যাদায় মনসব প্রদান করা হ'ত। যেহেতু প্রথমতঃ ৫ হাজারীর উর্ধ্ব মনসব কাকেও প্রদান করা হত না, সুতরাং শিবাজীকেও প্রথম প্রথম এই মনসবই (৫ হাজারী) দেওয়া যেতে পারত। যাঁরাই ৭ হাজারী বা ১০ হাজারী মনসব পেয়েছেন তাঁরা সকলেই উন্নতি করতে করতে ঐ পদমর্যাদায় পৌঁছে গিয়েছেন। শিবাজীর বেলাতেও এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম করা সম্ভবপর ছিল না।

শিবাজীকে সৌজন্য প্রদর্শন করলে তিনি ভক্ত ও অনুরক্ত হয়ে পড়তেন, ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণের এই দাবী ঐতিহাসিক প্রমাণাদির একান্তই বিরোধী। শিবাজীর সারা জীবনে প্রতিশ্রুতি রক্ষার একটি নজিরও পাওয়া যায় কি? আফজল খাঁকে প্রতারণাপূর্বক হত্যা, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সহযোগে চক্রান্তমূলক ষড়যন্ত্র, শহর এবং পল্লীর উপর অতর্কিত নৈশ-আক্রমণ ইত্যাদি ঘটনাবলীর দ্বারা, কি তাঁর ভক্তে পরিণত হওয়ার আশা সূচিত হয়?

কবিতায় আছে :

> ঐ জালেম বর্বরটার চরিত্র সম্বন্ধে আমি পূর্বেই অবগত ছিলাম, কিন্তু প্রতিশ্রুতি প্রদানের পরেও যদি এরূপ কার্যে লিপ্ত হয়, তা'হলে কি করতে পারি?

পূর্ববর্তী বর্ণনায় অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, মারহাট্টাদেরকে আলমগীর উত্যক্ত করেননি বরং শাজাহানের সময়েই তারা এত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে, তাদের বিরুদ্ধে শাজাহানকে তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করতে হয়েছিল। তা'ছাড়া এই সমস্যার সমাধান হেতু তিনি স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে গমন করেছিলেন। এ বিষয়টাও পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে, আলমগীরের সৈন্যগণ শিবাজীকে এমন পঙ্গু করে দিয়েছিল যে, তিনি সেনাপতির সম্মুখে নিরস্ত্র অবস্থায় হাজির হতে বাধ্য হয়েছিলেন। অধিকন্তু এ বিষয়টাও ঐতিহাসিক সত্যে প্রতিপন্ন হয়ে গিয়েছে যে, আলমগীর শিবাজীর প্রতি যে ব্যবহার প্রদর্শন করেছেন, তা কোনক্রমেই শিবাজীর সম্মান ও মর্যাদার পক্ষে হানিকর ছিল না। অতএব আলোচনার বস্তু এখন এই যে, শিবাজী তাঁর শক্তি প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছিলেন এবং শেষ দিন পর্যন্ত আলমগীরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেই থাকলেন।

তাঁর মৃত্যুর পরেও স্বীয় স্থলাভিষিক্তগণ আলমগীরের সমস্ত রাজ্যের শৃঙ্খলা উলট-পালট করে ফেললেন।

সমস্ত ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের বর্ণনা এই যে, আলমগীর মারহাট্টাদের দমন করতে সম্পূর্ণ অপারগ হয়ে পড়েছিলেন। এমনকি তিনি মারাঠাদেরকে চৌথ প্রদান অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যের ৬টি সুবার এক-চতুর্থাংশ আয় প্রদান করাও মঞ্জুর করেছিলেন। এলফিনিস্টন সাহেব যদিও চৌথ প্রদান করার কাহিনী অস্বীকার করেন, তথাপি লিখেছেন, "আওরঙ্গজেবের কর্মকর্তাগণের (সরদারগণের) রদবদল করা শিবাজীর পক্ষে অত্যধিক কল্যাণপ্রসূ হয়েছিল। এই কারণেই রাজা যশোবন্ত সিং শাহজাদা মোয়াজ্জমের উপর প্রভাবশীল এবং বাদশার সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপারে হিন্দুদের নিকট অধিকতর প্রিয় ছিলেন। অধিকন্তু জনসাধারণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তিনি (যশোবন্ত সিং) নিজেও লোভী ছিলেন, অতএব টাকা পেলেই বশীভূত হতেন। মোটকথা, এই সমস্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার মানসে শিবাজী তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করলেন। শেষ ফল এই দাঁড়ালো যে, শিবাজী যশোবন্ত সিংহের ও শাহজাদা মোয়াজ্জমের সহযোগিতায় এমন সুন্দর সুন্দর শর্তে বাদশার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করলেন যে, এটা তাঁর কল্পনারও অতীত ছিল। পরিণতিস্বরূপ, তাঁর অনেকগুলো রাজ্য তাকে ফিরিয়ে দেয়া হল ও সুবায়ে বেরারে জায়গীর তাকে দেওয়া হল এবং তাঁর 'রাজা' উপাধিও স্বীকার করে নেয়া হ'ল। ফলে তাঁর সমস্ত রকম অপরাধের গুরুত্ব ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে লাগল।" (এলফিনিস্টন সাহেবের ইতিহাসের অনুবাদ, আলীগড়ী ছাপা, পৃঃ ১০৫৭)।

বিস্তারিত আলোচনায় যোগদান করার পূর্বে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ কিভাবে আসল ব্যাপারকে চাপা দিয়ে বিকৃত আকারে তা প্রচার করে থাকেন তাই প্রদর্শন করছি।

প্রকৃত ঘটনা এই যে, যখন শিবাজী পলায়ন করে দাক্ষিণাত্যে পৌঁছলেন এবং দশম অভিষেক বর্ষে' মোয়াজ্জম শাহ যশোবন্ত সিংহের সমভিব্যাহারে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিযুক্ত হয়ে এলেন, তখন শিবাজী যশোবন্ত সিংকে অনুরোধ জ্ঞাপন করলেন। তিনি তাঁর পুত্র শম্ভুজীকে প্রেরণ করছেন তাঁকে যেন সৈন্যবিভাগে কোন পদ মঞ্জুর করা হয়। যশোবন্ত সিং এ অনুরোধ রক্ষা

করলেন। শিবাজী তখন শম্ভুকে এক সহস্র সৈন্যসমেত শাহজাদা মোয়াজ্জমের খেদমতে পাঠিয়ে দিলেন। যেহেতু আলমগীরের দরবারে শম্ভাজী পূর্বেও ৫ হাজারী মনসব পেয়েছিলেন এবং শিবাজীর নজরবন্দী অবস্থাতেও দরবারে হাজির হতে তাঁকে বাধা প্রদান করা হয়নি; বরং তিনি প্রত্যহ দরবারে উপস্থিত হয়ে মুজরায় যোগদান করতেন; সেহেতু মোয়াজ্জম শাহ তাঁকে ৫ হাজারী মনসব এবং সুবায়ে বেরারে জায়গীর প্রদান করলেন। 'মাসেরে আলমগীরি' গ্রন্থের ২য় খণ্ডে ৩৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে :

> "শাহজাদার পৌঁছবার পর মহারাজা যশোবন্ত সিং-এর নিকট (শিবাজী) তিনি আবেদন জানালেন যে, তিনি তাঁর পুত্র শম্ভাকে প্রেরণ করছেন, তাঁকে যেন একটা মনসব প্রদান করে বাধিত করা হয় ও প্রেরিত সৈন্য-বাহিনীসহ তাকে কাজে লাগানো হয়। এই আবেদন যদি মঞ্জুর হয় তা' হলে পুত্রপ্রবরকে যেন 'প্রতাপ রাও' নামক পদে নিযুক্ত করা হয়। তিনি (শিবাজী) শম্ভাকে এক হাজার অশ্বারোহীসহ প্রেরণ করলেন। ৫ হাজারী মনসবে নিয়োজিত হবার পর ৫ হাজার অশ্বারোহী, হাতী, স্বর্ণমণ্ডিত অস্ত্র এবং সুবায়ে বেরারে জায়গীর ইত্যাদি প্রাপ্ত হলেন।"

বর্ণনা এইরূপই ছিল, যা থেকে এলফিনিস্টন সাহেব উপরে লিখিত ঘটনাবলী উদ্ধৃত করেছেন। আশ্চর্যের বিষয়, ওতে তিনি কি রকম রং দিয়েছেন! 'শিবাজী বশ্যতা স্বীকার করবার অনুমতি প্রার্থনা করলেন এবং তাঁর পুত্রকে চাকুরী গ্রহণের জন্য প্রেরণ করলেন। আবেদন গৃহীত হ'ল এবং চাকুরী বহাল হ'ল।' কিন্তু চাকুরীতে পুনর্বহাল হওয়া এবং জায়গীরপ্রাপ্ত হওয়া শাহী-দরবারের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। শত শত কর্মচারী অপরাধ করত, চাকুরী থেকে অপসারিত হত, আবার ক্ষমা প্রার্থনা করে পুনর্বহাল হত। তাদের মনসব ও জায়গীর তারা ফিরে পেত। এতে অস্বাভাবিক ও আশাতীত ব্যাপার কি ছিল? অথচ এলফিনিস্টন সাহেব বলছেন, 'এমন সুন্দর সুন্দর শর্তে তিনি বাদশার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেছিলেন যে, সে-সংই তার আশার অতীত ছিল।' এই আশাতীত শর্তগুলো কি ছিল? উত্তরে বলতে হবে—'চাকুরীতে পুনর্বহাল এবং জায়গীরপ্রাপ্তি।' মাসেরুল উমারাতে 'রাজা' উপাধির কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু উল্লেখ থাকলেই বা কি হত? নিম্নপদস্থ

কর্মচারিগণ পর্যন্ত 'রাজা' খেতাব প্রাপ্ত হতেন। শম্ভুজীও এই 'খেতাব'ই পেয়েছিলেন। কিন্তু এলফিনিস্টন সাহেব এই 'খেতাব'টাকে এমন তাৎপর্যপূর্ণ মনে করছেন যে, শম্ভুজীকে যেন একজন স্বাধীন নরপতি বলে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। এ সমস্ত বাদ দিলেও 'রাজা' উপাধি শম্ভুজীই পেয়েছিলেন, শিবাজী পাননি। অথচ এলফিনিস্টন সাহেব শিবাজীর প্রতিই ওটা আরোপ করছেন। শম্ভুজী শুধুমাত্র জায়গীর পেয়েছিলেন, যা স্বভাবতঃই পদস্থ কর্মচারীদেরকে প্রদান করা হত। পক্ষান্তরে এলফিনিস্টন সাহেব বলছেন যে, তাঁর রাজ্য তাঁকে ফেরৎ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ আলমগীর যেন তাঁর রাজ্যাধিপতি হওয়াই স্বীকার করে নিয়েছিলেন। লক্ষ্য করুন, সামান্য একটা বাক্যের অর্থের ভিতরে এলফিনিস্টন সাহেব কতখানি বাড়াবাড়ি এবং কি রকম আমূল পরিবর্তন সাধন করেছেন।

চৌথের ব্যাপার এই যে, দাক্ষিণাত্যে দীর্ঘকাল যাবৎ এই প্রথা প্রচলিত ছিল এবং সে-সময় পর্যন্ত এই নিয়ম চালু ছিল যে, তহশীলদার বা কালেক-টারদের স্থলে দেশমুখগণ কাজ করত। তাঁরা খাজানা আদায় করে সরকারী তহবিলে জমা দিত। আদায়কৃত অর্থের এক-দশমাংশ বা তদপেক্ষা কিছু বেশি তাদের প্রাপ্য হত। শিবাজী ও তাঁর স্থলাভিষিক্ত শম্ভুজী এবং রামরাজা যখন মৃত্যুমুখে পতিত হন তখন রামরাজার পত্নী তারাবাঈ, যে মহিলা অত্যন্ত সাহসিকা ও উচ্চাভিলাষিণী ছিলেন, তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ ষড়যন্ত্র ও বিবাদের শৃঙ্খল ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু অবশেষে অপারগ হয়ে আবেদন জানালেন যে, শতকরা ৯৲ হারে (দশ টাকার স্থলে) দেশমুখার মনসব প্রদান করা হোক। কিন্তু আলমগীর তা মঞ্জুর করেননি।

খাফী খাঁ লিখছেন :

"অমর শাহানশাহের (আলমগীরের) রাজত্বের শেষভাগে তারাবাঈ রাণী, যিনি রামরাজার পত্নী ছিলেন এবং স্বামীর মৃত্যুর পরেও ১২ বৎসর যাবৎ বাদশার সঙ্গে বৈরীভাব পোষণ করে আসছিলেন, তিনি এবং তাঁর কতিপয় উকিল অবশেষে দাক্ষিণাত্যের ৬টি সুবার শতকরা ৯৲ টাকা হারে সরদেশমুখী প্রদানের শর্তে সন্ধি স্থাপনের প্রার্থনা জানালেন। কিন্তু মহামান্য বাদশাহ ইসলামের মর্যাদা রক্ষার্থে এবং আরও বিভিন্ন কারণে এই শর্ত গ্রহণ করেননি।" (খাফী খাঁ, পৃঃ ৭৮৩)।

এলফিনিস্টন সাহেব গুরুতর বিদ্বেষ পোষণ করা সত্ত্বেও তিনি স্বীকার করেছেন যে, আলমগীর মারাঠাদেরকে চৌথ প্রদানে সম্মত হননি। তিনি লিখেছেন :

"বাদশাহ নামদারের অবস্থা এখন এতই শোচনীয় হয়ে পড়েছিল যে, কামবখ্শের পরামর্শে তিনি মৈত্রী স্থাপনের জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন। এমনকি মারহাট্টাদের অহেতুক আবদার এবং অশোভনীয় ব্যবহারের জন্য যদি মৈত্রীপত্রের লেখাপড়া বন্ধ না হত তা হলে খুবসম্ভব তিনি সাহুকে কয়েদ থেকে মুক্তি প্রদান করতেন এবং দাক্ষিণাত্যের আয় থেকে বার্ষিক শতকরা এমন একটা মোটা অংশ মঞ্জুর করতেন যাতে তাঁর কথার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ না হত।" (পৃঃ ১২৬)।

আলমগীরের পর ১১১৯ হিজরীতে বাহাদুর শাহের জামানায় রাজা সাহুর উকিল জুলফিকার খাঁর মারফত সরদেশমুখীর সনদ পাওয়ার জন্য দরখাস্ত পেশ করেছিলেন। বাহাদুর শাহ তা মঞ্জুরও করেছিলেন। কিন্তু স্বয়ং মারাঠাদের অনৈক্যবশতঃ সেটা মুলতুবী রয়ে গেল। (খাফী খাঁ, পৃঃ ৬২৬ ও ৬২৭)। মৌলবী গোলাম আলী আজাদ 'খাজানায়ে আমেরা' গ্রন্থে ভুলক্রমে লিখে দিয়েছিলেন যে, আলমগীর ঐ সনদ লিখে দিয়েছিলেন। অবশ্য পরে তাঁর এ ভুল ভেঙ্গে গিয়েছিল। তিনি লিখেছেন :

"অবশেষে বাদশার রায় বদলে গেল এবং মৈত্রীপত্র (ছায়ের মালং) যার সনদ তখনও মারাঠা শত্রুদের হস্তে অর্পণ করা হয়নি, তিনি চেয়ে পাঠালেন।" (খাজানায়ে আমেরা, নলকেশোর ছাপা, পৃঃ ৪১)।

আজাদের বর্ণনা যদিও সমস্ত ঐতিহাসিকদের বর্ণনার বিরোধী, তথাপি তারও সারমর্ম এই যে, শেষ পর্যন্ত আলমগীর মারাঠাদের আবেদন মঞ্জুর করেননি। এই সকল প্রমাণপুঞ্জীর মোকাবেলায় ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের ঐরূপ বর্ণনা নিতান্তই বিস্ময়কর। কিন্তু সেটা যদি স্বীকার করেও নেওয়া যায় তবু জ্ঞাত থাকা দরকার যে, সরদেশমুখীর পদ প্রজাবৃন্দ ও অধীনস্থ কর্মচারীদেরকে হুবহু ঐভাবেই দেওয়া হত, যেমন ইংরেজ গভর্নমেণ্টের পূর্বে এখানে চৌধুরী ও মুখীয়াগণ ছিল। আজও দাক্ষিণাত্যে শত শত দেশমুখ বৃন্দ আছে। কিন্তু ইউরোপীয়ানগণ এর ব্যাখ্যা এমনভাবে করেছেন যাতে

বর্তমান জগতের সমস্ত নব্য শিক্ষিতের দল বুঝে নিয়েছেন যে, আলমগীর দুর্বল হয়ে পড়ে খাজানা বা ট্যাক্সরূপে মারহাট্টাদেরকে এই অর্থ প্রদানে সম্মত হয়েছিলেন। এই সকল উদাহরণ থেকে অনুমান করে নেওয়া যায় যে, একটা মাত্র শব্দের বিকৃত ব্যাখ্যার ফলে গোটা ইতিহাসের চেহারাই বদলে যায়।

চৌথ অথবা দেশমুখী মঞ্জুর করার কাহিনী একদম মিথ্যা। তবু এইটুকু উত্তরে মূল আলোচ্য বিষয়টার মীমাংসা সম্ভব হচ্ছে না। বিরোধী দল বলতে পারেন বা বলে থাকেন যে, যদিও আলমগীর কোন অর্থ প্রদানে সম্মত হননি, কিন্তু মারাঠারা তাঁর রাজ্যের স্তম্ভগুলি প্রকম্পিত করে তুলেছিল। এলফিনিস্টন সাহেবের লেখা পড়ুন :

"মারাঠাগণ যতই আওরঙ্গজেবের বিরাট সৈন্যবাহিনীর নিকটবর্তী হতে লাগল, ততই তাঁর বিপদ বেড়ে চলল। এমনকি কখনো কখনো মারাঠারা লুটপাট করতে করতে 'ধুন' সৈন্যদল পর্যন্ত এসে পড়ছিল। যুদ্ধের রসদ-গুলোও তারা কেটে নিত। পশুগুলোকে সম্মুখ থেকে তুলে নিয়ে যেত। হাতীর মাহুতদেরকে হত্যা করে ফেলত। অবস্থা এতই শোচনীয় করে তুলেছিল যে, যতক্ষণ না জাতীয় রক্ষীবাহিনী সঙ্গী না হ'ত ততক্ষণ তারা একা একা কেউ ছাউনীর বাইরে যেতে সাহস করত না। যদি সাধারণ একটা সৈন্যদলকেও দৈত্যগিরি করার জন্য পাঠানো হত, ঐ সৈন্যদল-টাকেও মারধর করে তাড়িয়ে দেয়া হত অথবা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হত। আলমগীরের শেষের দিককার যুদ্ধবিগ্রহের অবস্থা এত হীন হয়ে পড়েছিল যে, তিনি আহমদনগর প্রত্যাবর্তন করলেন এবং তাঁর প্রত্যাবর্তনের দুরবস্থা তাঁর শ্রান্ত-ক্লান্ত পশুগুলির এবং বিপর্যস্ত সৈন্যদলের অবস্থা দেখলেই অনুভব করা যেত। বস্তুতঃ সৈন্যদল দুর্বলতা, প্রাণহীনতা এবং বিশৃঙ্খলাবশতই পশ্চাদপসরণ করছিল। রাইফেল বাহিনীর অবিশ্রান্ত গুলীচালনার ফলে তাদের কান বধির হয়ে গিয়েছিল। বর্শাধারীদের আক্রমণের ফলে এরা ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। সর্বদাই তাদের এই আতঙ্ক ছিল যে, হয়ত বা এখনই মারাঠাগণ এসে পড়বে এবং তাদেরকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলবে।"

এই সকল ঘটনা পর্যালোচনাকল্পে আমাদেরকে প্রথমতঃ শিবাজী ও তাঁর স্থলাভিষিক্তদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করা দরকার।

শিবাজী যখন আকবরাবাদ থেকে দাক্ষিণাত্যে পৌঁছল তখন গোলকুণ্ডা রাজ্যের সহায়তায় শাহী-সাম্রাজ্যাভ্যন্তরে লুটপাট শুরু করে দিল এবং কতিপয় দুর্গও অধিকার করে ফেলল। এরই প্রতিকার হেতু আলমগীর মাঝে মাঝে সৈন্য মোতায়েন করতেন। তাঁর সৈন্যবাহিনী কখনও বা জয়লাভ করত, আবার কখনও পরাজিত হত। অবশেষে ২৩তম অভিষেক বর্ষে মোতাবেক ১০৯০ হিজরীতে শিবাজী মৃত্যুমুখে পতিত হন। (খাফী খাঁ, পৃঃ ৭২৭১)। এরপর তাঁর পুত্র শম্ভুজী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি অতর্কিতভাবে বুরহানপুর আক্রমণ করেন এবং নিতান্ত বর্বতা ও নিষ্ঠুরতার সঙ্গে সমস্ত শহর লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ করেন। তথাকার ওলামাগণ ও মাশায়েখগণ তখন আলমগীর সমীপে এই মর্মে এক স্মারকলিপি প্রেরণ করলেন যে, এদেশ এখন দারুল হরবে পরিণত হয়ে গিয়েছে; এখন আর এখানে জুমআ ও জামাআত জায়েজ নয়।

আলমগীর তখন পর্যন্ত মারহাট্টাদের নৃশংসতার প্রতি সবিশেষ মনোযোগী ছিলেন না। কিন্তু এই বেদনাদায়ক ঘটনা তাঁকে ব্যথিত করে তুলল। স্মারক-লিপির জওয়াবে তিনি লিখলেন যে, তিনি স্বয়ং আসছেন। তিনি ২৫তম রাজ্যাভিষেক বর্ষে দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করলেন এবং আওরঙ্গাবাদে অবস্থান করে জ্যেষ্ঠপুত্র মোয়াজ্জম শাহকে মারাঠাদের আমূল বিলোপ ঘটাবার জন্য প্রেরণ করলেন। মোয়াজ্জম শাহ কোকেনের সমস্ত এলাকা ধ্বংস করতে করতে শেষ প্রান্তে গিয়ে পৌঁছলেন। কিন্তু আবহাওয়ার আদ্রতা ও রসদাদির দুষ্প্রাপ্যতা হেতু হাজার হাজার মানুষ ও জীবজন্তু মৃত্যুমুখে পতিত হল। ফলে, আলমগীর তাঁকে ফিরে আসতে আদেশ দিলেন। এরপর মাঝে মাঝেই তিনি তথায় সৈন্যসমাবেশ করতে থাকলেন। কিন্তু যেহেতু শম্ভুজী বিজাপুর ও হায়দ্রাবাদ থেকে সাহায্য পেতেই থাকলেন, সেহেতু তাঁর সৈন্যদল কৃতকার্যতা লাভ করতে পারেনি। আলমগীর তখন মারাঠাদের তরফ থেকে দৃষ্টি অপসারণ করে হায়দ্রা-বাদের প্রতি মনোনিবেশ করলেন এবং ঐ রাজ্য অধিকার করে শাহী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন।

এই অভিযান থেকে অবসর গ্রহণ করবার পর ৩৪তম রাজ্যাভিষেক বর্ষে, মোতাবেক ১১০১ হিজরীতে বাদশাহ আলমগীর শম্ভুর মূলোচ্ছেদনকল্পে মোকাররব খাঁকে প্রেরণ করলেন। তিনি কোলাপুরে পৌঁছে শিবির স্থাপন করলেন এবং সেখান থেকে অবগত হতে পারলেন যে, শম্ভা ২।৩ হাজার অশ্বারোহীসহ সঙ্গমিজে অবস্থান করছেন। যদিও এই স্থান কোলাপুর থেকে ৪৫ ক্রোশ দূরে এবং রাস্তা এতই দুর্গম ছিল যে, মোকাররব খাঁকে স্থানে স্থানে ঘোড়া থেকে নেমে পদব্রজে চলতে হয়েছিল। তা সত্ত্বেও মার্চ করতে করতে তিনি এত দ্রুত পৌঁছে গিয়েছিলেন যে, সম্ভা শতর্ক হবার সুযোগ পেতে না পেতেই তথায় পৌঁছে গেলেন। তাঁর সঙ্গে যেহেতু মাত্র দুই-তিন শত অশ্বারোহী ছিল, তা' দেখে শম্ভাও যুদ্ধায়োজন করলেন। কিন্তু পরাজয় বরণ করে পরিবারবর্গসহ জীবন্ত বন্দী হয়ে গেলেন। শম্ভা ভয়ানক নিষ্ঠুর ও জালেম ছিলেন। শুধু মুসলমানগণই নয় বরং হিন্দুগণও তার বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতামূলক লুন্ঠনকার্যের জন্য অশ্রুষিক্ত ছিল। সুতরাং তাঁর বন্দী হওয়ার সংবাদে সমস্ত দেশের মধ্যে আনন্দের ঢেউ খেলে গেল। তিনি যখন শৃঙ্খলিত পদে আলমগীরের দরবারে প্রেরিত হন, তখন যেদিক দিয়ে তিনি হাঁটছিলেন সেদিকের রাস্তায় রাস্তায় ভদ্র মহিলাগণ পর্যন্ত ঘর থেকে বেরিয়ে এসে এই দৃশ্য দেখছিল এবং আনন্দে নৃত্য করছিল। খাফী খাঁ লিখছেন :

> "অন্তঃপুরবাসিনীগণও গ্রেফতার হয়েছিল এবং তাদের পুরুষদের হাত-পা জিঞ্জিরাবদ্ধ ছিল। শুভলগ্নে এই খবরটা রটা মাত্র আপামর জনসাধারণ তাদের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। এটা কি স্বপ্ন না সত্য, তা প্রত্যক্ষ করার জন্য ১০ মঞ্জিল পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে তাদের গ্রেফতারকারীকে অভিনন্দন জানাচ্ছিল। প্রত্যেক শহরে এবং গ্রামে, সরাইখানায় ও চতুর্দিকে যেখানেই এই সংবাদ পৌঁছে যাচ্ছিল, ঢোল বাজিয়ে সকলেই আনন্দ করছিল। যেদিকেই ঐ বন্দীগণ অগ্রসর হচ্ছিল, দরজায় এবং ছাদে ভিড় করে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকেই এই তামাশা উপভোগ করছিল। (খাফী খাঁ, পৃঃ ৩৮৯)।

মোটকথা সম্ভুকে আলমগীরের দরবারে হাজির করা হল। মুখের উপরে আমলগীরকে তিনি অশ্রাব্য ভাষায় গালি-গালাজ করলেন। আলমগীর

তাঁর জিহ্বা কেটে ফেলবার আদেশ দিলেন। তারপর তার চক্ষু উৎপাটন করে তাঁকে হত্যা করে ফেললেন। এখানে স্মরণ রাখা উচিত যে, আলমগীরের সুদীর্ঘ ৫০ বৎসরব্যাপী রাজত্বকালের ঘটনাবলীর মধ্যে এই একটাই মাত্র ব্যতিক্রম। অন্যথায় তিনি কাউকেই কখনো এহেন বর্বরোচিত শাস্তি প্রদান করেননি।

শম্ভুর সঙ্গে তার পুত্র সাহু এবং তার মাতাও গ্রেফতার হয়ে এসেছিলেন। তাদের বেলায় আলমগীর এরূপ উদারতা ও উন্নত মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন, যার নজির ইতিহাসে একান্তই বিরল। তিনি সাত বা আট বৎসরের বালক সাহুকে ৭ হাজারী মনসব এবং 'রাজা' খেতাব প্রদান করলেন। তার জন্য একটা সরকার স্থাপন করে দেন ও বখশী নিয়োগ করলেন। আরও নির্দেশ দিলেন যে, তার ক্যাম্প সর্বদাই শাহীক্যাম্পের সন্নিহিত স্থানে স্থানলাভ করবে। তার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় মদন সিং ও উদয় সিংহের প্রতিও অনুরূপ মর্যাদা দান করলেন।

এটা উদারতার পরিচয় ছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু দূরদর্শিতার কাজ ছিল না। খাফী খাঁ সত্যই লিখেছেন, "এটা একটা সাপ মেরে তার বাচ্চা রাখার ন্যায় ব্যাপার।"

হিন্দু সমাজে বন্দী অবস্থায় কেউ খাদ্যাদি গ্রহণ করত না। এই নিয়মের অনুসরণ করতে গিয়ে সাহু শুধু মিষ্টান্ন ও ফলমূল আহার করে জীবন যাপন করছিলেন। আলমগীর এই খবর অবগত হয়ে সাহুকে হামিদুল্লা খাঁর মারফত বলে পাঠালেন যে, তিনি কয়েদখানায় নয় বরং নিজের ঘরেই বাস করছেন। সুতরাং বিনাদ্বিধায় তার খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। (মাসেরে আলমগীরি, কলিকাতায় ছাপা, পৃঃ ৪৩৩)।

আলমগীরকে তাঁর বিপক্ষ দল বিদ্বেষপরায়ণ ও সঙ্কীর্ণমনা বলে থাকেন। কিন্তু বিদ্বেষ যদি এরই নাম হয়, তাহলে সহস্র সহস্র বিদ্বেষহীনতার আখ্যাও তাঁরই প্রাপ্য হওয়া উচিত। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সাহুর প্রতি তাঁর ব্যবহার সম্পূর্ণ মুরব্বীয়ানা ও উদারতাপূর্ণ ছিল। এরই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আলমগীরের মৃত্যুর পর সাহু যদিও স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করেছিলেন, তথাপি তাঁর অনুগ্রহকে তিনি বিস্মৃত হতে পারেননি। সর্বপ্রথম তিনি তাঁর কবর জেয়ারত করতে যান। (মাসেরুল উমারা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫১)।

সম্ভুর মৃত্যুর পর তার ভাই রামরাজা তার স্থলাভিষিক্ত হন এবং কয়েক স্থানে শাহী সৈন্যবৃন্দকে গুরুতরভাবে পরাজিতও করেন। তাঁর সৈন্যবাহিনীতে শান্তা ও ধন্তা নামে দুইজন নামকরা সেনানায়ক ছিলেন। এরা দশ-বার হাজার সৈন্যের এক একটা বাহিনী নিয়ে গোটা দেশের মধ্যে লুণ্ঠন কাজ চালাতে লাগলেন। তাঁরা এতখানি ত্রাসের সঞ্চার করেছিলেন যে, শাহীসৈন্যের অধিনায়ক পর্যন্ত তাদের সম্মুখীন হতে ইতস্তত বোধ করতেন।

প্রতিপক্ষ দল এই সকল ঘটনাকে অত্যন্ত ফলাও করে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু পরিণামে ১১০৬ হিজরীতে শান্তা নিহত হন। রামরাজা তাঁর অধিকৃত অঞ্চল থেকে পলায়ন করে উদাসীন ও ভবঘুরে জীবনে বেরারের এলাকায় শহরতলী ও পল্লী অঞ্চল লুণ্ঠন করে ফিরতে থাকেন। সন ১১১০ হিজরীতে তিনিও মৃত্যুমুখে পতিত হন। রামরাজার মৃত্যুর পর তার স্ত্রী তারাবাঈ মারহাট্টাদের নেতৃত্ব লাভ করেন। রামরাজার ন্যায় তিনিও দীর্ঘদিন আলমগীরকে উত্যক্ত করেছিলেন।

এমতাবস্থায় আলমগীর মারাঠাদের সমূলে উচ্ছেদ সাধনকল্পে দৃঢ়সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন। এর জন্য সর্বপ্রথম কাজ ছিল তাদের আশ্রয়স্থল দুর্গগুলো দখল করা। কিন্তু ঐগুলো এত সুরক্ষিত ছিল যে, তা দখল করা কারও পক্ষে সহজ-সাধ্য ছিল না। কতকগুলো দুর্গ দুই দুই মাইল ব্যবধানে অবস্থিত ছিল। রাজ-গড়ের দুর্গ বা শিবাজীর রাজধানীবৎ ছিল, তার আয়তন ১২ মাইল ছিল। রাস্তা এত দুরতিক্রম্য ছিল যে, অবিরাম চলতে থাকলেও কয়েকদিনে মাত্র এক এক ক্রোশ অতিক্রম করা যেত। রাস্তার এই বিপদসঙ্কুলতা সম্পর্কে লেনপুল সাহেব লিখছেন :

"মার্চ করবার সময় অনতিক্রম্য নদী, প্লাবিত উপত্যকা, কর্দমাক্ত নালা এবং সঙ্কুচিত পথসমূহ অতিক্রম করা কতই না কষ্টকর ছিল। যেখানেই রসদের আয়োজন না করা যেত সেখানেই তাদের থেমে যেতে হত। কচি ঘাসের অভাবে মালবাহী পশুগুলো এতই কাহিল হয়ে যেত যে, সৈন্যবাহিনী একেবারে পঙ্গু হয়ে পড়ত। বর্ষাকাল ব্যতীত গ্রীষ্মকালেও মনজিলসমূহের কষ্ট, ক্যাম্পের অসুবিধা এবং পানীয় জলের অভাব ইত্যাদি বর্ণনার অতীত ব্যাপার।"

আলমগীরের বয়স তখন ৮২ বৎসর। তথাপি এই অমিততেজা পুরুষ স্বহস্তে এই অভিযানের কামান ধারণ করলেন এবং একটা একটা করে সবগুলো দুর্গই অধিকার করে ফেললেন। এলফিনিস্টন সাহেব নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সাক্ষ্যদান করছেন :

"আওরঙ্গজেব স্বীয় রণনৈপুণ্য প্রদর্শন করে চললেন। এমনকি ৪ বৎসরে বড় বড় সমস্ত দুর্গগুলোই নিজস্ব দখলে নিয়ে এলেন। অনেক দীর্ঘস্থায়ী ও রক্তক্ষয়ী অবরোধ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উভয় পক্ষেই নানারকম চেষ্টা ও বিভিন্ন প্রকার কায়দা-কৌশল চলতে থাকল। কিন্তু ঐ সকল তদবির এত উপর্যুপরি ও একের পর এক অনুষ্ঠিত হয়েছিল যে, তার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করা নিতান্তই কঠিন বরং অসম্ভব। তবে হাঁ, পরিণামে ঐ দুর্গগুলো সমস্তই অধিকৃত হয়ে গেল।" (এলফিনিস্টন সাহেবের ইতিহাস, আলীগড়ী ছাপা, পৃঃ ১১৭)।

মোটকথা ১১১৭ হিজরী মোতাবেক ৪৯তম অভিষেক বর্ষে অর্থাৎ আলমগীরের মৃত্যুর ২ বৎসর পূর্বে মারাঠাদের কবলিত সমস্ত দুর্গ এবং সুরক্ষিত স্থানগুলো অধিকৃত হয়ে গিয়েছিল। আলমগীর কৃষ্ণানদীর নিকটবর্তী দিবাপুরে অবস্থান ক'রে ঐ অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার সাড়া দানকল্পে এবং প্রজাবৃন্দকে স্ব স্ব গৃহে ফিরে আসতে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য হুসায়েন কুলী খাঁকে নিযুক্ত করলেন। (মাসেরে আলমগীরি, পৃঃ ৫০৭)।

মারহাট্টিরা এই সময় একেবারেই গৃহহীন হয়ে পড়েছিল। তারা সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় কাজাক ও দস্যুদের ন্যায় যদৃচ্ছা নৈশ আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল। এটা স্বাভাবিক ব্যাপার যে, যখনই কোন নূতন দেশ বিজিত হয়, তখনই তথায় কিছুদিন এইরূপ অবস্থাই চলতে থাকে। ব্রহ্মদেশ যখন ইংরেজ-কবলিত হয়, তখন যদিও ঐ বেচারাদের হাতে যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম কিছুই ছিল না, তথাপি কয় বৎসর যাবৎ ঐ ধরনের অরাজকতা সেখানে বিরাজ করছিল। ইংরেজ বাহিনী পোড়ানীতি গ্রহণ করে পল্লীতে ও শহরতলীতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তার প্রতিদান দিচ্ছিল। এই হিন্দুস্তানেও ইংরেজ শাসনের প্রাথমিক অবস্থায় দীর্ঘদিন যাবৎ পিণ্ডারীগণ শত শত মাইল পর্যন্ত ধাওয়া করে ফিরছিল। যতদিন গভর্নমেন্ট তাদেরকে বিরাট বিরাট সম্পত্তি প্রদান করে বাধ্য করতে না পেরেছিল ততদিন শান্তি স্থাপন করা সম্ভবপর হয় নাই।

সুতরাং এরচেয়ে গুরুতর বিদ্বেষ এবং অবিচারআর কি হতে পারে যে, ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ ঐ সকল দস্যুবৃত্তিকে এই আকারে দেখাচ্ছেন যে, তৈমুরী রাষ্ট্র একটা মৃতদেহ, যা মারাঠাগণ চতুর্দিক থেকে ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে খাচ্ছিল। এলফিনিস্টন সাহেব লিখছেন :

"মারাঠা বাহিনী যতই আওরঙ্গজেবের বিরাট সৈন্যবাহিনীর নিকটবর্তী হ'ত ততই তাঁর বিপদ ঘনিয়ে আসত। এমনকি তারা লুটপাট করতে করতে কখনো কখনো শাহী সৈন্যবাহিনীর প্রান্ত পর্যন্ত এসে পড়ত ; পশুগুলোকে সম্মুখ থেকে নিয়ে যেত ; হাতীর মাহুতদেরকে হত্যা করত এবং প্রহরারত সৈন্যদেরকে বিদ্রূপ করত। অর্থাৎ এদের এমনই সন্ত্রস্ত করে রেখেছিল যে, যতক্ষণ জাতীয় রক্ষীদল তাদের পাশে এসে না দাঁড়াত, ততক্ষণ একাকী ছাউনীর বাইরে যেতে কেউ সাহস করত না, ইত্যাদি।"

এলফিনিস্টন সাহেব যদিও মারাঠাদের শক্তি ও আলমগীরের দুর্বলতাকে অত্যন্ত ফলাও করে দেখাতে চেয়েছেন, কিন্তু মারাঠাদের যে গুণাবলী তিনি কীর্তন করেছেন—অর্থাৎ রসদের উপর ডাকাতি হানা, চতুষ্পদ জন্তুগুলোকে অপহরণ করা, প্রহরীদেরকে বিদ্রূপ করা, হাতীর মাহুতদের হত্যা করা ইত্যাদি সমস্তই তো দস্যুদের কার্য। বর্তমানে এই ধরনেরই শক্তি ও সামর্থের বলে সীমান্তে খোদ ইংরেজ গভর্নমেন্টের সঙ্গে সীমান্তের জাতিগুলো ইত্যাকার নোংরামী করে আসছে। কিন্তু তাতে কি ইংরেজশক্তির দুর্বলতা এবং সীমান্ত জাতিগুলোর বীরত্ব ও প্রতিপত্তি প্রমাণিত হয় ?

এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, কোন শক্তিশালী রাষ্ট্রের বা জাতির উচ্ছেদ সাধন একদিনেই সম্ভব নয়। উদয়পুর রাজকে বাবর পরাজিত করেছিলেন। কিন্তু আকবরের জামানায় তারা আবার সেই পূর্বশক্তিতেই বিরাজ করছিল। আকবর বিপুল বিক্রমে আক্রমণ করলেন এবং কয়েক মাস অবরোধ করে রাখবার পর উদয়পুরের উপর পূর্ণ প্রতিষ্ঠা স্থাপন করলেন। মহারাজা জঙ্গলে ও পর্বতে পলায়ন করে আত্মরক্ষা করলেন। তা সত্ত্বেও জাহাঙ্গীরের জামানায় উদয়পুরের পূর্ব-যৌবন বিরাজমান ছিল। শাজাহান তাঁর যুবরাজ অবস্থায় উদয়পুর আক্রমণ করলেন এবং এমন বিক্রমের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন যে, মহারানা অস্ত্র ত্যাগ করলেন এবং বশ্যতা জ্ঞাপনার্থ তাঁর পুত্র করণকে দরবারে প্রেরণ করলেন। করণ দরবারে

উপনীত হয়ে জাহাঙ্গীরকে সেজদা করলেন। কিন্তু শাজাহান স্বয়ং যখন সিংহাসনে উপবেশন করলেন, তখন এই অবনত মস্তক আবার সমুন্নত হয়ে উঠেছিল। তিনি আর একবার এ অভিযানের অবসান ঘটালেন; কিন্তু আলমগীরের সময় এই উদয়পুর আবার সেই আকবরের সময়ের উদয়পুর হয়ে দেখা দিল। অবশ্য আলমগীর উপর্যুপরি আক্রমণ করে উদয়পুরকে এমনভাবে বিধ্বস্ত করে ফেলেছিলেন যে, তা আর কখনও মাথা উঠাতে পারেনি।

শা'জাহানের রাজত্বকালে মারাঠাগণ পূর্ণশক্তি অর্জন করেছিল। দাক্ষিণাত্য থেকে মাদ্রাজ পর্যন্ত তারা বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। অত্যন্ত মজবুত ও গগনস্পর্শী শত শত দুর্গ তাদের দখলে ছিল। এই সকল প্রশ্ন ছাড়াও তারা একটা জীবন্ত জাতিরূপে গড়ে উঠেছিল। মোটকথা, এটাই ছিল তাদের উন্নতির প্রকৃত যৌবনকাল। ঠিক এই রকম সময়ে আলমগীরকে তাদের মোকাবেলা করতে হল। তবু পরিণাম কি হল? লক্ষ্য করুন, আলমগীরের জীবদ্দশাতেই শিবাজী মৃত্যুমুখে পতিত হলেন; শম্ভা মানবলীলা সংবরণ করলেন; রামরাজা উদাসীন ও ভবঘুরে জীবন যাপন করতে করতে জীবনের ইতি ঘোষণা করলেন; শাম্ভার ছিন্নমুণ্ড দরবারে পৌঁছল। মোটের উপর, বিদ্রোহের পতাকাবাহিগণ একে একে সকলেই কালের করালগ্রাসে পতিত হলেন। ফলে, দাক্ষিণাত্য থেকে মাদ্রাজ পর্যন্ত সমুদয় দুর্গগুলি অধিকার করে ফেলবার পর পূর্ণ নীরবতা বিরাজ করতে লাগলো।

"এমন কোন কণ্টক নাই, যার আঘাতে শিকারী রক্তিত হয় না, সে শিকারী একটা বিপদস্বরূপ ছিল, যে এই মাঠ ধরে চলে গিয়েছে।"

মারাঠা শক্তি এখন আর কোন জাতি বা রাষ্ট্র বলে বিবেচিত ছিল না। বরং গৃহহীন দস্যুবেশে উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াত। সুযোগ পেলেই চুরি, অতর্কিত আক্রমণ ও লুণ্ঠন কার্যে প্রবৃত্ত হত। এর পরপরই আলমগীর এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। তারপর তাঁর স্থলাভিষিক্তদের কর্তব্য ছিল মারাঠাদের হাওয়ায় উড়ে যাওয়া ধূলিকণাগুলোকেও নিশ্চিহ্ন করে ফেলা। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস! তৈমুরী সাম্রাজ্য মোয়াজ্জম শাহের করতলগত হল। নির্মম ইতিহাস লেখকেরাও অযোগ্য উত্তরাধিকারীদের দোষগুলো নির্বিচারে মহিমান্বিত পূর্বপুরুষদের আমলনামায় লিপিবদ্ধ করে রেখে গেলেন। এর চেয়ে গুরুতর

অবিচার আর কি হতে পারে? সত্যিকার কথা এই যে, পাঠশালার এক একটা শিশু যাদের মুখ থেকে এখনও মাতৃস্তন্যের গন্ধ বিচ্ছুরিত হচ্ছে তারাও সম্রাট আলমগীরের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছে। কিন্তু এ হতভাগাগুলোর তো দোষ নয়!

"আমাকে হত্যা করার এই যে নৃত্যাভিনয় তা আমি জানতাম, এই ষড়যন্ত্রের উৎস কোথায় তাও আমি জানতাম।

আওরঙ্গজেব আলমগীর ও হিন্দুদের অসন্তোষ

আলমগীরের প্রতি আরোপিত দোষাবলীর এটা চতুর্থ দফা। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই চতুর্থ দফাটি কতিপয় দোষের সমষ্টি, অর্থাৎ

১। রাজপুত রাজন্যবর্গ, যাঁরা এযাবৎ তৈমুরী রাষ্ট্রের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিলেন, তাঁরা আলমগীরের ব্যক্তিগত আচরণে বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছিলেন।

২। আলমগীর হিন্দু জনসাধারণের মনে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিলেন। প্রথমোক্ত অপরাধটাকে লেনপুল সাহেব নিম্নলিখিত ভাষায় ব্যক্ত করেছেন:

"যে রাজপুত জাতি আওরঙ্গজেবের শাসনকালের প্রথমাবস্থায় মুঘল সাম্রাজ্যের দক্ষিণ হস্ত ছিল, তারাই এখন এমনভাবে সরে পড়েছিল যে, আর মিলিত হবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। যতদিন তারা আকবরের সিংহাসনের প্রতি বিশ্বস্তভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল ততদিন তাদের সাহায্য ও সংরক্ষণের পক্ষপুটে বাস করায় একজন রাজপুতও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অঙ্গুলীসঙ্কেত করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেনি।"

লেনপুল সাহেব এই অপরাধের ব্যাখ্যা দিচ্ছেন এইভাবে:

"১৬৬৮ খ্রীস্টাব্দে আওরঙ্গজেবের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু পক্ষান্তরে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজপুত রাজা জয়সিং মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। আর একজন প্রসিদ্ধ রাজপুত জেনারেল, যশোবন্ত সিং, যিনি কাবুলের গভর্নর ছিলেন, তাঁরও মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে আসছিল। অতএব আওরঙ্গজেব এখন হিন্দুদেরকে কার্যকরীভাবে ধ্বংস করবার উপায় অবলম্বনে, যা প্রত্যেকটি খাঁটি মুসলমানেরই লক্ষ্য, তাতে বাধা-বন্ধনহীন হয়ে পড়লেন। অবশ্য ঐ সময় পর্যন্ত হিন্দুরা কোনরূপ নিপীড়িত হয়নি বা ধর্মকাজেও বাধাপ্রাপ্ত হয়নি। কিন্তু এতে সন্দেহ নেই যে, আলমগীর তাঁর অন্তরের অন্তঃস্তলে এই ইসলামী জোশ পোষণ করছিলেন। নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে যাতে কাফেরদের মোকাবেলা করতে পারেন, শুধু সেই সময়ের অপেক্ষায় ছিলেন। মনে হয় ১৬৬৯ খ্রীস্টাব্দ থেকেই কালমেঘের এই ঘনঘটা দেখা দিল।

আওরঙ্গজেব যশোবন্ত সিংহের ব্যাপারে আরও একটা অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি চাচ্ছিলেন যে, যশোবন্ত সিংহের পুত্রদ্বয় শিক্ষালাভের জন্য দিল্লীতে প্রেরিত হোক। তাহ'লে নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর সযত্ন লালন-পালনে তাদেরকে মুসলমান করে নিতে পারতেন। রাজপুতগণ এই নির্দেশ পালন করেনি। অধিকন্তু যখন তারা জানেত পারল যে, আওরঙ্গজেব অতীতের সেই ইসলামী ট্যাক্স অর্থাৎ জিজিয়া-কর আবার নূতন করে জনৈক হিন্দুর উপর প্রবর্তন করেছেন তখন তাদের ক্রোধের আর সীমা রইল না।"

ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের প্রশ্নাবলী (যা সম্মুখে আসছে) যদিও শূন্যে পাদুকা স্থাপনের ন্যায় এবং তজ্জন্য তার উত্তর প্রদান করাও নিতান্তই সহজ, তথাপি উত্তর প্রদানকারীকে বেশ মুশকিলেই পড়তে হয়। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ কোন প্রমাদপূর্ণ প্রশ্নের বর্ণনা দিতে গিয়ে তার সঙ্গে আরও অনেকগুলো মিথ্যা জুড়ে দিয়ে থাকেন। উত্তরদাতা একটা মিথ্যার উত্তর দিতে গিয়ে আর একটা মিথ্যার সম্মুখীন হয়ে পড়েন। সেটার উত্তর দিতে গেলে আবার আর একটা মিথ্যা তাঁর সামনে এসে পড়ে। এই রকম উপর্যুপরি ও বিরামহীন মিথ্যার চাপে পড়ে উত্তরদাতা আপনা-আপনিই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। ফলে ধীর ও স্থির মস্তিষ্কে প্রকৃত তথ্য উদঘাটন করার পরিবর্তে তিনি ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠেন। স্বয়ং আমার উপরেও এ ধরনের প্রতিক্রিয়াই দেখা দিয়েছে। কিন্তু তবু আমি আমার প্রতিপক্ষকে আমার ক্রোধ ও ক্ষোভের দ্বারা লাভবান হবার কোন সুযোগ দেব না। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকেরা হিন্দুদের অসন্তোষের যে সকল কারণ বর্ণনা করেছেন, তাতে আলোচনাটা জগা-খিচুড়ীতে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক, এই উভয়বিধ বিষয়ের এক মিশ্রিত বিষয় আলোচনায় পর্যবসিত হয়েছে। ফলে আলোচ্য বিষয়টার প্রকৃত রহস্য উদঘাটন ও তার সঠিক তথ্য পরিবেশন হেতু দুটা বিষয়েরই পৃথক পৃথক আলোচনা প্রয়োজন। প্রথমতঃ আমি রাজনৈতিক কারণগুলো নিয়েই আলোচনা আরম্ভ করছি।

হিন্দু শক্তির তিনটি কেন্দ্র ছিল,—জয়পুর, যোধপুর ও উদয়পুর। তন্মধ্যে জয়পুর ও যোধপুর সম্পূর্ণ বশীভূত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বাবর থেকে

শাজাহানের রাজত্বকাল পর্যন্ত উদয়পুরের অবস্থা এমন ছিল যে, আক্রান্ত হলেই সে নতিস্বীকার করে বসত। আক্রমণকারী প্রস্থান করার সঙ্গে সঙ্গে আবার যে বিদ্রোহী সেই বিদ্রোহীই সেজে যেত। শাজাহান তাঁর পীড়িতাবস্থায় যখন দারাশেকোকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে তাঁকে সমস্ত ক্ষমতার অধিপতি করে দিলেন, তখন জয়পুর ও যোধপুরের শাসনকর্তা যথাক্রমে রাজা জয়সিংহ ও যশোবন্ত সিং ছিলেন। আলমগীর যখন দাক্ষিণাত্য থেকে আকবরাবাদে যাত্রা করলেন, তখন দারাশেকোর পক্ষ থেকে যশোবন্ত সিংহ আলমগীরের পথে বিরাট এক সৈন্যদল নিয়ে উজ্জয়িনীতে অবস্থান করছিলেন। আলমগীর বিশেষ অনুনয়ের সাথে বলে পাঠালেন যে, তিনি কেবলমাত্র পীড়িত সম্রাটকে দর্শন করতে যাচ্ছেন। সুতরাং তিনি যেন তাতে অন্তরায় না হন। যশোবন্ত সিং তাতে কর্ণপাত করেননি। ফলে গুরুতর যুদ্ধ সংঘটিত হল। যশোবন্ত সিং পরাজিত হয়ে পলায়ন করলেন। রাজছত্র যখন আলমগীরকেই ছায়াদান করল, তখন তার প্রথম বছরেই যশোবন্ত সিং অবনত শিরে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। আলমগীরও উদারতার সঙ্গে তাকে ক্ষমা করলেন। ভ্রাতা সুজার সঙ্গে যখন যুদ্ধ আসন্ন হয়ে পড়ল আলমগীর তখন যশোবন্ত সিংকে একটা দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করলেন। কিন্তু তিনি প্রথম থেকেই মির্জা সুজার সঙ্গে গোপন পরামর্শে লিপ্ত ছিলেন। উভয়পক্ষের সৈন্যবাহিনী যখন পরস্পর সম্মুখীন, তখন হঠাৎ যশোবন্ত সিং রাত্রির শেষভাগে তাঁর সৈন্যদলসহ আলমগীরের সৈন্যদল থেকে বেরিয়ে গিয়ে সুজার দলে যোগদান করলেন। তাঁর সৈন্যগণ শাহী আসবাবপত্র ও ধনাগারের উপরও হস্তক্ষেপ করল। এমন উলট-পালট হয়ে গেল যে, আলমগীরের সমস্ত সৈন্যের অর্ধেক প্রায় যশোবন্ত সিংহের সমভিব্যাহারে সুজার সঙ্গে এসে মিলিত হল। এটি এমনই একটা সঙ্কটময় পরিস্থিতি ছিল যে, তা সামলাবার জন্য আলগীরের ন্যায় ব্যক্তিরই মন ও মস্তিক প্রয়োজন ছিল। এমতাবস্থাতেও আলমগীরের ধৈর্যের ললাটে একটা কুঞ্চিত রেখামাত্রও পরিদৃষ্ট হয়নি। এহেন অসহায় অবস্থাতেও জয়টীকা তাঁরই ললাটে শোভিত হল। কিছুদিন পরে যখন যশোবন্ত সিংহের আর কোথায়ও দাঁড়াবার স্থান থাকলো না তখন পুনরায় তিনি আলমগীর সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। এবারও তিনি তাকে মহানুভবতা প্রদর্শন করলেন। কিন্তু যেহেতু

লজ্জায় তার মাথা হেঁট হয়ে গিয়েছিল, আলমগীর তার অনুপস্থিতিতেই মনসব, খেতাব ও জায়গীর বহাল করে তাকে আহমদনগরের সুবাদার নিযুক্ত করলেন।

মাঝে মাঝে তাকে বিরাট বিরাট অভিযানেও প্রেরণ করতেন। এমনকি দাক্ষিণাত্যে শিবাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রীর জন্যও তাকে প্রেরণ করেছিলেন। (এর পূর্ণ বিবরণ যদিও খাফী খাঁ প্রভৃতি সমস্ত ইতিহাসেই পাওয়া যায় তবু ধারাবাহিক ও বিস্তারিত আলোচনার জন্য মাসেরুল উমারা, ৩য় খণ্ড দ্রষ্টব্য)। কিন্তু এই বিশ্বাসঘাতক এখানেও তার স্বভাবসিদ্ধ আচরণ পরিত্যাগ করেননি। এলফিনিস্টন সাহেব লিখছেন :

"রাজা যশোবন্ত সিং শাহজাদা মোয়াজ্জমের স্বভাবের উপর প্রভাবশীল এবং বাদশার সঙ্গে স্থাপিত সম্পর্কে তিনি হিন্দুদের অধিকতর হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তা'ছাড়া জনসাধারণের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, তিনি লোভী ছিলেন এবং টাকা-পয়সা দ্বারা বশীভূতও হতেন। মোটকথা, এই সকল কারণেই শিবাজী তার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করলেন।" (এলফিনিস্টন সাহেবের ইতিহাসের অনুবাদ, আলীগড়ী ছাপা, পৃঃ ১০৫৭। মাসেরুল উমারা গ্রন্থেও এর উল্লেখ পাওয়া যাবে)।

যশোবন্ত সিং এখানেই শেষ করেননি। বরং রাওভাও সিং, যিনি বুন্দী রাজ্যের রাজা, তিন-হাজারী মনসবপ্রাপ্ত এবং এই অভিযানে তার সঙ্গী ছিলেন, তাকে নিজের সঙ্গী করে নিতে চাইলেন। কিন্তু যখন তিনি (রাও-ভাও সিং) নেমকহারামী করতে অস্বীকার করলেন, তখন তিনি তার স্ত্রীকে (রাওভাও সিংহের ভগ্নীকে) বাড়ী থেকে ডেকে এনে বিক্রয় করে ফেললেন। কিন্তু তা' সত্ত্বেও এই কৃতজ্ঞ ব্যক্তি নেমকের মর্যাদাকে সম্পর্কের ঊর্ধ্বে স্থান দান করলেন। মাসেরুল উমারাতে রাওভাও সিংহের বর্ণনায় লিখিত আছে :

"যেহেতু রাওভাও সিংহের ভগ্নী মহারাজা যশোবন্ত সিংহের পত্নী ছিল, তিনি স্বীয় পত্নীকে বাড়ী থেকে ডেকে এনে স্থির করলেন যে, তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন। কিন্তু তবু রাওভাও সিং নেমকের হককে প্রাধান্য দান করে তাঁর সঙ্গে যোগদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করলেন।"

অবশেষে যশোবন্ত সিং কাবুলের যুদ্ধে যোগদানে আদিষ্ট হলেন। তিনি আলমগীরের ২২তম অভিষেক বর্ষে মারা গেলেন। তিনি যখন মৃত্যুমুখে

পতিত হন তখন পর্যন্ত নিঃসন্তান ছিলেন, কিন্তু তাঁর কর্মচারিগণ দরবারে সংবাদ প্রেরণ করল যে, তাঁর উভয় স্ত্রীই গর্ভবতী। অতঃপর লাহোরে পৌঁছে গিয়ে তারা দরবারে রিপোর্ট প্রেরণ করল যে, তাঁর দুই স্ত্রীর গর্ভে দু'টি পুত্র-সন্তান জন্মলাভ করেছে। তার সঙ্গে তারা এও নিবেদন করল যে, ঐ পুত্রদ্বয়কে মনসব, রাজা ও খেতাব প্রদান করা হোক। আলমগীর ফরমান পাঠালেন, "পুত্রদ্বয়কে দরবারে প্রেরণ কর। যখন তারা বয়োপ্রাপ্ত হবে, তখন তাদেরকে খেতাব ও মনসব প্রদান করা হবে।" মাসেরে আলমগীরিতে আছে ঃ

"সম্রাটের আদেশ হল যে পুত্রদ্বয়কে শাহী দরবারে আনয়ন করা হোক। যখনই তারা বয়ঃপ্রাপ্ত হবে তখনই তাদেরকে দস্তুর মোতাবেক মনসব প্রদান করা হবে।" (পৃঃ ১৭৭)।

তৈমুরী রাজসভার এটা একটা প্রচলিত আইন ছিল যে, যখনই শাহান-শাহের অধীনে উচ্চ-পদধারী কোন ব্যক্তি নাবালক সন্তান রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হন, তখনই বাদশাহ স্বয়ং ঐ শিশু-সন্তানদের লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং শাহজাদাদের ন্যায় তাদের সঙ্গে আচরণ প্রদর্শন করেন। এই আইনের বশবর্তী হয়েই আলমগীর যশোবন্ত সিংহের পুত্রদ্বয়কে তলব করেছিলেন। কিন্তু যশোবন্ত সিংহের সেই চিরাচরিত অভ্যাস তাঁর কর্মচারিগণের উপরেও প্রতিফলিত হয়েছিল। দেখা গেল, তারা বাদশার আদেশ পৌঁছবার অপেক্ষা না করেই দিল্লী রওয়ানা হয়ে গিয়েছে। আটক নদীর তীরে নৌ-সেনাধ্যক্ষ রাস্তার পাসপোর্ট চেয়ে বাধা প্রদান করলেন। তারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল এবং অনেকগুলো লোক হত্যা করে জোরপূর্বক নদী পার হয়ে গেল। যখন রাজধানীর নিকটে এসে পড়ল তখন অবাধ্যতা ও বিদ্রোহমূলক আচরণের জন্য আলমগীর তাদেরকে নগরের বাইরে অবস্থান করবার নির্দেশ দিলেন। একটা সৈন্যবাহিনীসহ তাদের নজরবন্দী করে রাখবার জন্য কোতোয়ালকে হুকুম দিলেন। কিছুদিন পর তারা জন্মভূমিতে ফিরে যাবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করল। আলমগীর অনুমতি দিলেন। কিন্তু এই কপটাচারীর দল চুপে চুপে যশোবন্ত সিংহের সন্তানদ্বয়কে অপসারণ করে ফেলল এবং সেখানে ২টা ভুয়া (জাল) ছেলেকে রেখে গেল। যেহেতু এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ এবং অনুসন্ধান-সাপেক্ষ ঘটনা এবং এরই উপরে ভাবী ইতিহাসের ভিত্তি রচিত হয়েছে,

একে অধিকতর বিশদ করে তুলবার জন্য খাফী খানের মূল লেখাটাই অবিকল উদ্ধৃত করে দিলাম :

"অতপর দেখা গেল, রাজার মৃত্যুর পর তার মূর্খ অনুচরবৃন্দ অজিত সিং ও দলছমন নামক রাজার শেষ বয়সের ২টা শিশু-সন্তান ও রাণীকে সঙ্গে নিয়ে রাজদরবারে রওয়ানা হল। অথচ সম্রাটের আদেশ অথবা পাসপোর্ট কিংবা সুবাদারের অনুমতি কিছুই গ্রহণ করবার প্রয়োজন বোধ করল না। তারপর আটক নদের তীরে পৌঁছলে রেভিনিউ সেক্রেটারী পাসপোর্ট না থাকার জন্য তাদেরকে বাধা প্রদান করলেন। ফলে যুদ্ধ বেধে গেল। তারা কলহ ও হত্যা সাধন এবং রেভিনিউ সেক্রেটারী ও অন্যান্য বহু লোককে আহত করে জোরপূর্বক নদী পার হয়ে গেল। যখন রাজধানীর নিকটবর্তী হল, মৃত যশোবন্তের অতীত গ্লানিকর কার্যকলাপ শাহানশাহের স্মৃতিপট থেকে তখনও মুছে যায়নি। তদুপরি রাজপুতদের ঔদ্ধত্যের সংবাদ অবগত হয়ে শাহানশাহ তাদেরকে শহরের বাইরে বারপোলার নিকট অবস্থান করবার আদেশ দিলেন। কোতোয়ালকে তার লোকজন মনসবদার ও তোপ-খানার পাহারাওয়ালাসহ একটা দল নিয়ে সংলগ্ন ক্যাম্পগুলোর চতুর্দিকে পাহারা বসিয়ে রাজপুতদেরকে নজরবন্দী করে রাখতে হুকুম দিলেন।"
(এর পরবর্তী ঘটনা যেহেতু খুব গুরুত্বপূর্ণ ও মতানৈক্যমূলক ছিল না, সেজন্য সে লেখাটুকু উদ্ধৃত করিনি)।

যশোবন্ত সিংহের কর্মচারীরা তার শিশু-সন্তানদেরকে নিয়ে যোধপুর চলে গেল। উদয়পুরের মহারানা স্বীয় তত্ত্বাবধানে তাদের গ্রহণ করলেন। আলমগীর মহারানাকে ফরমান প্রেরণ করলেন, তিনি যেন বিদ্রোহীদের সাহায্য করতে বিরত থাকেন এবং যশোবন্তের পুত্রদ্বয়কে তাঁর হস্তে সমর্পণ করেন। মহারানা তাতে কর্ণপাত করলেন না। আলমগীর তখন যোধপুরে সৈন্য প্রেরণ করলেন। মহারানা বশ্যতা স্বীকার করলেন। অধিকন্তু প্রতিশ্রুতি প্রদান করলেন যে, যশোবন্তের পুত্রদ্বয়কে কোন প্রকার সাহায্য করবেন না। কিন্তু অনতিকাল পরেই মহারানা এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলেন। আলমগীর এর প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে সমস্ত স্থান থেকে সৈন্য সংগ্রহ করলেন এবং স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্র আকবরকে ঐ সৈন্যদলের সেনাপতি নিযুক্ত করে উদয়পুর প্রেরণ

করলেন। মহারানা স্তোকবাক্যে আকবরকে হস্তগত করে ফেললেন। তিনি উস্কানী দিলেন, 'আমি আপনাকেই বাদশা বলে স্বীকার করব, আপনি স্বয়ং সিংহাসন ও মুকুটের দাবী উত্থাপন করুন।' অকালকুষ্মাণ্ড শাহজাদা কয়েক সহস্র সৈন্য নিয়ে পিতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হলেন। আলমগীরের অশ্বারোহী সৈন্যদলে তখন মাত্র এক সহস্র অশ্বারোহী মৌজুদ ছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও তার ধৈর্য বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি। পরিণামে আকবর পলায়ন করলেন।

ক্রমিক বর্ণনানুসারে এবং সমস্ত ইতিহাস একত্রিতভাবে বর্ণনা করবার প্রয়াসে আমি সমগ্র ঘটনাপুঞ্জী নিতান্ত সরলভাবে লিপিবদ্ধ করলাম। এখন নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অনুধান করলে দেখা যায় :

১। আলমগীর কি রাজপুত নরপতিগণের সঙ্গে অশোভনীয় আচরণ প্রদর্শন করেছিলেন, যে জন্য তাঁরা বিদ্রোহ করতে বাধ্য হয়েছিলেন?

২। আলমগীর কি রাজপুতদের পর্যুদস্ত করতে পারেননি?

৩। রাজপুতেরা কি এই ঘটনা ঘটবার পর চিরদিনের জন্য আলমগীর থেকে সরে পড়ল?

ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের মতে এ সকল প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর এই যে, আলমগীর স্বয়ং রাজপুতদেরকে উত্যক্ত করে তুলেছিলেন, তাদেরকে বিদ্রোহ করতে বাধ্য করেছিলেন এবং তাদের প্রতি যথারীতি কর্তব্য স্থাপনে সক্ষম হননি। বিধায় রাজপুতগণ চিরদিনের জন্য তৈমুরী রাষ্ট্রের আনুগত্যের নাগপাশ ছিন্ন করে সরে পড়ল। রাজপুতদের যে তিনটি কেন্দ্র ছিল, তা ইতিপূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে জয়পুর চিরদিনই অনুগত ছিল। এলফিনিস্টন সাহেব নিজেও এ ঘটনা স্বীকার করেছেন এবং লিখেছেন :

> "রাজপুত নরপতিগণ যখন স্বজাতীয় একজন নরপতির গৃহে এরূপ জোর-জুলুম অনুষ্ঠিত হতে দেখল এবং তদুপরি জিজিয়ার ন্যায় অবাঞ্ছিত কর চেপে বসল তখন সমস্ত রাজপুতেরা একতাবদ্ধ হয়ে পড়ল। কিন্তু জয়পুরের রাজা রামসিং, যাঁর বংশের সঙ্গে শাহী খান্দানের নানারূপ আত্মীয়তা ছিল এবং পুরুষানুক্রমে সম্মানজনক পদসমূহে অধিষ্ঠিত থাকার জন্য ঐ সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ ও দৃঢ় ছিল, তিনি উক্ত রাজপুত দলে যোগদান করা থেকে বিরত থাকলেন।"

এখন থাকলো যোধপুর ও উদয়পুর। যোধপুরের রাজা ছিলেন যশোবন্ত সিং। তিনি আলমগীরের সঙ্গে যে ব্যবহার করেছিলেন তা যথাক্রমে,

(১) তিনিই সর্বপ্রথম আলমগীরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন, আলমগীর জয়লাভ করে তাঁকে ক্ষমা প্রদর্শন করেন এবং সৈন্যদলের অধিনায়ক নিযুক্ত করেন।

(২) তথাপি শুজা-সংগ্রামে অত্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতার সঙ্গে রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে তিনি শত্রুর সঙ্গে মিলিত হন। যার ফলে আলমগীরের সেনাবাহিনীর মধ্যে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। আলমগীর পুনরায় ক্ষমা প্রদর্শন করেন এবং জায়গীর, খেতাব ও মনসাব প্রদান করে তাঁকে দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করেন।

(৩) সেখানে গিয়েও শিবাজীর সঙ্গে ষড়যন্ত্রে যোগ দেন।

(৪) অথচ তাঁর মৃত্যুর পর রাজপুতগণ প্রার্থনা জানায় যে, তাঁর ১ মাস বয়স্ক শিশুকে একটা রাজ্যের নরপতি করা হোক। আলমগীর তার উত্তর দেন যে, তাদেরকে রাজদরবারে প্রেরণ করা হোক, বয়ঃপ্রাপ্ত হলে সব কিছুই পাবে।

(৫) রাজপুতেরা বাদশার উত্তরের প্রতীক্ষাও করে নাই। বরং আটক নদীর তীরে শাহী কর্মচারীদেরকে মারধর করে দিল্লী উপনীত হয়, আলমগীর তখন তাদেরকে নজরবন্দী করেন। (এর বিস্তৃত ব্যাখ্যা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে)।

উল্লিখিত সমস্ত ঘটনার মধ্যে কোন একটাকেও অবিচার বলা যেতে পারে কি?

এলফিনিস্টন সাহেব বলেছেন, "রাজপুত রাজাগণ যখন নিজেদের দলীয় একজন রাজার ঘরে এইরূপ জুলুম হতে দেখলেন," কিন্তু এটা কি জুলুম ছিল? যশোবন্ত সিংহের সঙ্গী রাজপুতদের কার্যকলাপ কি এইরূপ ছিল যে, আলমগীর তাদের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে পারতেন? অল্প-বয়স্ক শিশুদের দরবারে আহ্বান করা কি কোন জুলুমের কাজ ছিল? বাদশার বিনা অনুমতিতে রাজপুতদের রাজধানীতে যাত্রা করা বশ্যতা স্বীকারের পরিপন্থী নয় কি? তাদেরকে বাধা প্রদান করা রেভিনিউ সেক্রেটারীর কর্তব্য ছিল না কি? রেভিনিউ

সেক্রেটারী ও শাহী কর্মচারীবৃন্দের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া এবং তাদেরকে হত্যা করা বিদ্রোহাচারণ নয় কি? ইত্যাকার আচরণ প্রদর্শন করবার পরও কি তাদের নজরবন্দী করা অবিচার হয়েছে? লেনপুল সাহেব রাজপুতদের অবাধ্যতা এবং উত্তেজনার কারণস্বরূপ বর্ণনা করছেন যে, যশোবন্ত সিংহের সন্তানদ্বয়কে আলমগীর মুসলমান করে ফেলতেন। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয়, আলমগীর শিবাজীর পৌত্র সাহুজীকে গ্রেফতার করেছিলেন। তখন তার বয়স মাত্র ৭ বৎসর ছিল। আলমগীর তাঁকে নিজস্ব তত্ত্বাবধানে রেখেছিলেন। শাহী ক্যাম্পের সংলগ্ন তাঁর ক্যাম্প স্থাপন করেছিলেন। তাকে ৭ হাজারী মনসব, রাজকীয় উপাধি এবং পতাকা দান করেছিলেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই ব্যবহার প্রদর্শন করে গিয়েছেন। তা সত্ত্বেও কেন তাকে ইসলামে দীক্ষিত করেননি? শিবাজীর পৌত্র অবশ্যই যশোবন্ত সিংহের পুত্রগণ অপেক্ষা অধিকতর জুলুম ও অত্যাচারের উপযোগী পাত্র ছিল।

লেনপুল সাহেব আরও একটা কারণ বর্ণনা করেছেন যে, জিজিয়া কর প্রবর্তন করার সংবাদে রাজপুতদের ক্রোধের সীমা ছিল না। জিজিয়ার আলোচনা ধর্মীয় বিষয়গুলোর মধ্যেই আলোচিত হবে। সুতরাং তা নিয়ে এখানে আর মাথা ঘামাচ্ছি না।

আর একটা অনুসন্ধান-সাপেক্ষ বিষয় এই যে, আলমগীর রাজপুতদের দমন করতে পেরেছিলেন কিনা। লেনপুল সাহেব লিখছেন :

"রাজপুতসর্পের দেহে সামান্য একটু আঘাত লেগেছিল মাত্র, কিন্তু তাতে তাঁর মৃত্যু ঘটেনি। যুদ্ধের গতি চলতেই থাকল। অবশেষে রাজপুতদের পক্ষ থেকে উদয়পুরের রানা, যিনি সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন, তিনি আওরঙ্গজেবের সঙ্গে এক সম্মানজনক সন্ধি স্থাপন করলেন। কারণ এই যুদ্ধে আলমগীরও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। এই সন্ধিপত্রে অপমানকর জিজিয়া করের নাম পর্যন্তও উল্লেখ ছিল না। কিন্তু রানা যেহেতু (আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে) শাহজাদা আকবরের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন তারই বিনিময়ে তাঁর রাজ্যের একটা ক্ষুদ্র অংশ ছেড়ে দিতে হল। অবশ্য রানা কিছুদিনের মধ্যেই সন্ধির শর্তাবলীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করলেন।"

আল্লাহ আকবর! এই কয়টা পত্রের মধ্যে কতই না মিথ্যা স্তূপাকার হয়ে আছে! এলফিনিস্টন সাহেব বলছেন :

"স্বয়ং আওরঙ্গজেব এই সকল যুদ্ধের অবসান কামনা করছিলেন। এর উপায়স্বরূপ কৌশলে তিনি উদয়পুরের রাজাকে মিত্রতা স্থাপনের জন্য উদ্বুদ্ধ করলেন। যখনই রানার তরফ থেকে সন্ধির প্রার্থনা জানান হল, সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সেদিকে মনোযোগ দিলেন। ফলে জিজিয়ার প্রতি অমনোযোগিতা প্রকাশ পেতে থাকল। রাজ্যের যে অংশটুকু জিজিয়ার বিনিময়ে গ্রহণ করেছিলেন, বিদ্রোহী আকবরকে সাহায্য করার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তা রেখে দিলেন।" (পৃঃ ২০৮)।

কিন্তু প্রকৃত ঘটনা এই যে, যোধপুর ও উদয়পুর দুটি রাজ্যই আলমগীরের সৈন্যগণ বিধ্বস্ত করে ফেললো। মহারানা তখন তাঁর রাজধানী উদয়পুর ত্যাগ করে রাজ্যের শেষ প্রান্তে পালিয়ে গেলেন। অবশেষে যখন সর্বোতভাবে নিরাশ হয়ে পড়লেন, তখন শাহজাদা মোহাম্মদ আজমের দ্বারা বাদশার নিকট সুপারিশ করালেন এবং মান্দেলপুর ও বঙ্কনুর পরগণাদ্বয় জিজিয়ার বিনিময়ে ছেড়ে দিতে রাজী হলেন। এরপর আলমগীর পুনরায় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ উদারতা প্রদর্শন করলেন এবং তাঁর ২৪তম অভিষেক বর্ষে, রানা যখন দরবারে উপস্থিত হলেন, তখন তাঁর জন্য খেলাত, খেতাব ও ৫ হাজারী মনসব অনুমোদন করলেন।

'মাসেরে আলমগীরি'তে লিখিত আছে :

"রানা যখন তাঁর রাজ্য ও বাসস্থান থেকে বিতাড়িত হলেন এবং তাঁর রাজ্যের শেষ সীমান্তে পালিয়ে গেলেন, তখন তাঁর পক্ষে স্বীয় নিরাপত্তা ও শাহানশাহের সহানুভূতি প্রার্থনা করা ব্যতীত গত্যন্তর রইল না। বিধায়, নিরুপায় মহারানা দরবারে সুপারিশ জানাবার জন্য অনুগ্রহপরায়ণ শাহাজাদা আজমের নিকট করজোড়ে মিনতি জানালেন এবং জিজিয়ার বিনিময়ে ও অপরাধের জরিমানাস্বরূপ মান্দেলপুর ও বঙ্কনুর পরগণাদ্বয় সম্রাটের হাতে সমর্পণ করতে প্রস্তুত হলেন। রানা তাঁর ভাগ্যোন্নতির ব্যবস্থাকল্পে শাহজাদার অধীনে চাকুরী গ্রহণ করলেন ইত্যাদি।" (এর পরবর্তী ঘটনাবলী আলোচনা-সাপেক্ষ নয় বলে সেগুলো পরিত্যাগ করেছি।

'মাসেরুল উমরাতে বর্ণিত আছে :

"রানা যখন উদয়পুর ত্যাগ করে পলায়ন করলেন, তখন হুসায়েন আলী খাঁর নেতৃত্বে একদল সৈন্য তাঁর পশ্চাদনুসরণের জন্য নিযুক্ত হল। পুত্র মোহাম্মদ আজম শাহ ও সুলতান উদয়পুরের মালিক ঘোষিত হলেন। যেহেতু সম্রাটের বিজয়বাহিনী সমগ্র রাজ্য দলিত ও মথিত করে ফেললো এবং রানা প্রিয় মাতৃভূমি থেকে বহির্গত হয়ে নিরাশ্রয় অবস্থায় ফিরতে লাগলেন, তখন অনন্যোপায় হয়ে তিনি ২৪তম অভিষেক বর্ষে বাদশাহকে সুপারিশ জ্ঞাপনার্থ করজোড়ে শাহজাদার শরণাপন্ন হলেন। জিজিয়ার বিনিময়ে মান্দেলপুর ও বদনুর দু'টা পরগণা বাদশার সরকারে সমর্পণ করলেন।" (মাসেরুল উমারা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২০৮ ; রানাকরণের আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

লক্ষ্য করুন, ঐ সকল বিশস্ত ইতিহাস গ্রন্থসমূহে পরিষ্কার লিখিত রয়েছে যে,

(১) রানা নিরুপায় হয়ে স্বয়ং ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। অথচ এলফিনিস্টন প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ বলেছেন যে, আলমগীর বাধ্য হয়ে নিজেই আপোষের প্রস্তাব দিলেন।

(২) ঐ সকল ইতিহাসে রয়েছে যে, রানা জিজিয়ার বিনিময়ে দুটি পরগণা সম্রাটের হাতে সমর্পণ করলেন। অথচ ইউরোপীয় ঐতিহাসিক প্রবর লিখছেন যে, ঐ সন্ধি-প্রস্তাবে জিজিয়ার নামগন্ধও উল্লেখ ছিল না। বরং ঐ দুটি পরগণা আকবরকে সাহায্য করার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ দিতে হয়েছিল।

(৩) এলফিনিস্টন ও লেনপুল সাহেবদ্বয় প্রত্যেক ব্যাপারেই তাঁদের চিরাচরিত নিয়ম অনুসারে ইতিহাসসমূহের প্রসঙ্গ প্রদান করে থাকেন। কিন্তু এ স্থলে কোন প্রসঙ্গ দেননি।

এই সমুদয় বর্ণনার মধ্যে লেনপুল সাহেবের সর্বাপেক্ষা মিথ্যা বর্ণনা এই যে, 'কিছুকাল পর রানা ঐ সন্ধিশর্ত জলাঞ্জলি দিলেন।' কিন্তু যেহেতু তাঁর এই মিথ্যা বর্ণনার সঙ্গী আর কেউ নেই, সুতরাং এ নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া নিষ্প্রয়োজন মনে করছি। অবশেষে প্রশ্ন রইল এই যে, (১) এই সকল ঘটনার পর রাজপুতেরা কি চিরদিনের জন্য তৈমুরীদের থেকে স্বতন্ত্র হয়ে গেল ?

(২) তারা কি, লেনপুল সাহেব যেমন বলেছেন, আর কখনও আলমগীরের অনুকূলে একটি অঙ্গুলিসঙ্কেতও করতে চায়নি ?

অতীতের সমুদয় ঘটনাবলীই আলমগীরের রাজ্যাভিষেক বর্ষ পর্যন্ত শেষ হয়ে গিয়েছে। উদয়পুরের মহারানা জগৎসিং ঐ বছরেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। আলমগীর তাঁর পুত্র জয়সিংকে শোকজনিত খেলাত এবং খেতাব ইত্যাদি প্রদান করলেন। ২৫তম অভিষেক বর্ষে আলমগীর দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ঐ অঞ্চলেই মারহাট্টাদের সঙ্গে যুদ্ধ—সংগ্রাম করতে থাকেন। এই সমস্ত যুদ্ধে আলমগীরের সেনাবাহিনীতে রাজপুত-সৈন্যসংখ্যা মুসলিম সৈন্যসংখ্যার অনুরূপ ছিল। প্রমাণস্বরূপ বলা যেতে পারে, ইতিহাসে যেখানেই সৈন্যসংখ্যার উল্লেখ পাওয়া যায়, রাজপুতদের নাম সেখানে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। যথা, খাফী খাঁ ১১১৬ হিজরীতে অনুষ্ঠিত ঘটনাবলীর মধ্যে মারহাট্টাদের একটা অবরোধ সম্পর্কে লিখছেন :

"প্রত্যেকটি যোদ্ধাই প্রাণপণ যুদ্ধ করছিলেন। বিশেষতঃ, হামিদুদ্দিন খাঁ এবং তেজঃবীর্য রাজপুতগণ ও অন্যান্য বীর যোদ্ধৃবৃন্দ বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। এমনকি জমশেদ খাঁ নামকরা রাজপুতদের বাহিনী, রায় দৌলত এবং আরও কতিপয় ব্যক্তির সমভিব্যাহারে কৃতকার্যতা অর্জন করেছিলেন।" (খাফী খাঁ, হালাতে আলমগীর, পৃঃ ২২৫)।

এই ঐতিহাসিকই ৩৬তম অভিষেক বর্ষের ঘটনাবলীর ব্যাপারে লিখছেন : "৩৬তম অভিষেক বর্ষে জিলহজ্জ চাঁদের প্রথম ভাগে রাজা জয়সিং যিনি তখনও যৌবনপ্রাপ্ত হননি, বাদশাজাদার সৈন্যদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আক্রমণ চালিয়েছিলেন। উপর্যুপরি আক্রমণ করে উপর থেকে গুলী, পাথর ও আতশবাজী জাতীয় দ্রব্যাদি বরফের ন্যায় অনতিদূর থেকে নিক্ষেপ করছিলেন। তাতে রাজপুত ও শাহজাদার সৈন্যবৃন্দ বিরাট সাফল্য লাভ করেছিলেন।" (খাফী খাঁ, পৃঃ ৪৯৯)।

ইউরোপীয় ঐতিহাসিক বলেন, একজন রাজপুতও আলমগীরের সাহায্যার্থ অঙ্গুলি সঞ্চালন করে নাই। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, শুধু রাজপুত সৈন্যবৃন্দই নয় বরং রাজপুতদের বড় বড় রাজা-মহারাজাগণও শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আলমগীরের সমভিব্যাহারে সৈন্যাভিযানে লিপ্ত ছিলেন এবং মারহাট্টাদের

ধ্বংস সাধন ব্যাপারে ইহারা মুসলিম অফিসারদের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। রাজপুতদের প্রকৃত শক্তিই ছিল যোধপুর, জয়পুর ও উদয়পুর। উদয়পুরের দুইজন যুবরাজ স্বয়ং আলমগীরের সৈন্যদলে উচ্চপদে সমাসীন এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর সাথী ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ ৪০তম অভিষেক বর্ষে তাঁদের মধ্যে ইন্দ্র সিং ২ হাজারী ও বাহাদুর সিং ১ হাজারী ও ৫ শত মনসবদারীতে অধিষ্ঠিত ছিলেন (মাসেরে আলমগীরী, পৃঃ ৪০৫, কলিকাতায় ছাপা)। এরা উভয়েই মহারানা রাজসিংহের পুত্র ছিলেন। মহারানা রাজসিং ২৫তম অভিষেক বর্ষে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রানা জয়সিংকে আলমগীর শোকজনিত খেলাত প্রদান করেন। ইন্দ্র সিং যোধপুরের নরপতি যশোবন্ত সিংহের বন্ধু ছিলেন। যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুর পর আলমগীর তাঁকে 'রাজা' উপাধি দান করেন এবং দাক্ষিণাত্যের অভিযান-সমূহের পরিচালনার ভার ন্যাস্ত করেন। তিনি নিতান্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করছিলেন। পুরস্কারস্বরূপ ৪৮তম অভিষেক বর্ষে ৩ হাজারী মনসব প্রাপ্ত হন। (মাসেরুল উমারা, অমর সিংহের আলোচনা)।

মানসিংহ রাঠোর, যিনি ৬ হাজারী মনসবদারীর সৌভাগ্য লাভ করে-ছিলেন, আলমগীরের ৩৫তম অভিষেক বর্ষে জুলফিকার খানের সমভিব্যাহারে দাক্ষিণাত্যের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ চঞ্জী অভিযানে প্রেরিত হয়েছিলেন (মাসেরুল উমারা, রূপসিংহের আলোচনা)। জয়পুরের রাজন্যবর্গের বিশ্বস্ততা ইউরোপীয় ঐতিহাসিকেরাও স্বীকার করেছেন। মাসেরুল উমারাতে আরও অনেক রাজপুত রাজা ও রাজন্যবর্গের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে, যাঁরা দাক্ষিণাত্যের অভিযানসমূহে আলমগীরের পক্ষে যোগদান করেছিলেন এবং নিতান্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে জীবনপণ করে স্বজাতি মারহাট্টা সৈন্যদলের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। আকবরের আমলে কবি শেকিবি বলেছিলেন :

"তাঁর রাজত্বকালে এই অবস্থাই দর্শন করলাম যে, হিন্দুগণ ইসলামের তরবারী (হিন্দুর বিরুদ্ধে) হানছে।

এই কবিতাছত্রটি শুধু আকবরের আমলে নয় বরং আলমগীরের আমলেও প্রযোজ্য ছিল। আজও যদি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম থাকত, আজও প্রযোজ্য হত।

লক্ষ্য করুন, জয়পুর, যোধপুর ও উদয়পুরের শাসনকর্তাগণ আলমগীরের পক্ষ থেকে দাক্ষিণাত্যে মারহাট্টাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, রাজপুত সৈন্যগণ মুসলিম সৈন্যবৃন্দের সঙ্গে সর্বদা একযোগে কাজ করে গিয়েছেন, রাজপুত নেতৃবৃন্দকে ৩ হাজারী ও ৪ হাজারী মনসব প্রদান করা হয়েছে, উদয়পুরের রাজা নাবালক হওয়া সত্ত্বেও দৃঢ়পদে মারহাট্টাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। এই সকল ঘটনাপুঞ্জী প্রমাণিত হবার পরেও "আলমগীর রাজপুতদের এমন বিরাগভাজন হয়ে পড়েছিলেন যে, তারা আর কখনই তৈমুরী পতাকাতলে সমবেত হয়নি" —ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের এই বাণীর ভিতরে সত্যতার কোন চিহ্ন নিহিত আছে কি?

কবিতায় আছে :

পুষ্পোদ্যানের বসন্ত-কাহিনী কোকিলের কাছেই শ্রবণকর
বিষণ্ণ কাকের দল আর এ কাহিনী কি বলিবে?

আওরঙ্গজেব আলমগীর ও হিন্দুদের সার্বিক অসন্তোষের কারণসমূহ

আলমগীরের অপরাধসমূহের মধ্যে এটাই সর্বাপেক্ষা গুরুতর এবং অনেকগুলো অপরাধের সমষ্টি। তিনি হিন্দুদেরকে সরকারী চাকুরী থেকে সম্পূর্ণ অপসারণ করেছিলেন, তাদের ধর্মীয় মেলা অনুষ্ঠানাদি বন্ধ করে দিয়েছিলেন, জিজিয়া প্রবর্তন করেছিলেন, বিদ্যালয়গুলো রুদ্ধ করে দিয়েছিলেন এবং মন্দিরগুলো ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। মোটকথা, তাদেরকে এতদূর নির্যাতিত করেছিলেন যে, তাদের অন্তরাত্মা চীৎকার করে বলে উঠল :

'জুলুম এতখানিই কর যে ভরসা না হারিয়ে ফেলি।'

বর্ণিত অপরাধগুলোর প্রকৃত ব্যাখ্যা এই যে, কতকগুলো খণ্ড ঘটনা ও কতকগুলো বিশেষ ঘটনা হলেও প্রতিপক্ষ দল সবগুলোকেই একই অর্থে ব্যবহার করেছেন। কতকগুলোর ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, আবার কতকগুলোর অনিবার্য কারণও রয়েছে। যাহোক, আমি প্রত্যেকটারই পৃথক পৃথক বর্ণনা দিচ্ছি। কিন্তু তার পূর্বে একটা জরুরী বিষয়ের আলোচনা প্রয়োজন।

আকবর যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন, তাতে হিন্দুদেরকে সিংহাসনের অংশীদার করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আকবরের শাসনদণ্ড ও প্রতিপত্তি যেহেতু সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল সেহেতু হিন্দুরা সীমা লংঘন করতে সাহস করেনি। পক্ষান্তরে জাহাঙ্গীরের মোলায়েম ব্যবহার ও মুরুব্বীপনা হিন্দুদেরকে নির্ভীক করে তুলেছিল। ফলে তাদের বাড়াবাড়ি উৎকট আকার ধারণ করল। জাহাঙ্গীরের যুবরাজ থাকা কালে তাঁরই ইঙ্গিতে নরসিং দেব বুন্দিলা আবুল ফজলকে প্রতারণাপূর্বক হত্যা করেছিল। তাঁর টাকা-পয়সা আসবাবপত্র ও সরকারী অর্থ যা কিছু সঙ্গে ছিল তা লুণ্ঠন করে নিয়েছিল। জাহাঙ্গীর যখন সিংহাসনে আরোহণ করলেন, নরসিং দেব তাঁর এই কার্যের বিনিময়ে মথুরায় মন্দির প্রতিষ্ঠা করবার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। জাহাঙ্গীর অনুমতি

দিলেন। নরসিং দেব শুধুমাত্র সেই টাকার মন্দির নির্মাণ করলেন যা আবুল ফজলকে হত্যা করে হস্তগত করেছিলেন। শের খাঁ লোদী, যিনি আবুল ফজলকে নিরীশ্বরবাদী সাব্যস্ত করেছিলেন এবং এই বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলেন যে, নিরীশ্বরবাদীর অর্থে উপাসনালয় নির্মিত হ'ল তথা 'হারাম অর্থ হারাম কাজেই ব্যয়িত হল'—তিনি এ ঘটনাটাকে তুলে ধরতে গিয়ে লিখেছেন,

> "সেই পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্তকারী আবুল ফজল সম্রাট নুরুদ্দিন মোহাম্মদ জাহাঙ্গীরের ইঙ্গিতক্রমে দাক্ষিণাত্যের পথে রাজা নরসিং দেবের রাজ্যে নিহত হলেন। অসদুপায়ে তিনি যে অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন, তা উক্ত রাজার হস্তে মথুরা অঞ্চলে হিন্দু উপাসনালয় নির্মাণে ব্যয়িত হল। এতে কোরানের পবিত্র আয়াতের (নাপাক বস্তু নাপাক বস্তুর জন্যই) অর্থই প্রতিপাদিত হল। অবশেষে ঐ মন্দিরটি হজরত আলমগীরের আদেশে ধূলিসাৎ হল।" (শের খাঁ লোদী কর্তৃক 'মারাতুল খেয়াল', কলিকাতায় ছাপা, পৃঃ ১২৮-১২৯ দ্রষ্টব্য)।

আকবরের রাজত্বকালে এতখানি ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও খুব-সম্ভব কোন নতুন মন্দির স্থাপিত হয়নি। জাহাঙ্গীর যদিও আকবরের তুলনায় গোঁড়া ছিলেন, কারণ তিনি কোটকাংরার যুদ্ধে জয়লাভ করে গরু জবেহ করার প্রথাকে প্রবর্তন করে আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। তথাপি যেহেতু রাষ্ট্র পূর্বের মত শক্তিশালী ছিল না, শুধুমাত্র বেনারসেই ৭৬টি নতুন মন্দির নির্মিত হয়েছিল। এর বিস্তৃত বিবরণ পরে আসছে। এই ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার পশ্চাতে আমার উদ্দেশ্য এই নয় যে, আমি ধর্মীয় স্বাধীনতার পক্ষপাতী নই। বরং উদ্দেশ্যে এই দেখানো যে, এই ঘটনাটা ভাবী ঘটনাবলীর পূর্বাভাস।

অর্থাৎ হিন্দুরা মুসলমানদের উপরে বেপরোয়া জুলুম ও অত্যাচার শুরু করেছিল। পরিস্থিতি এ পর্যায়ে এসে পড়েছিল যে, হিন্দুরা মুসলিম মহিলাদেরকে জোরপূর্বক বিয়ে করত এবং ঘরে আবদ্ধ করে রাখত। এর থেকেও গুরুতর ব্যাপার এই ছিল যে, মসজিদগুলোকে ভেঙ্গে তাদের বাসগৃহে পরিণত করত। আবদুল হামিদ কর্তৃক লিখিত 'শাজাহান নামার', যা শাজাহানের রাজত্বের ইতিহাস এবং স্বয়ং শাজাহানের আদেশে লিখিত। তাতে এই ঘটনাটা বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তার বর্ণনা নিম্নরূপ :

"যখন শাহী সৈন্যবাহিনী পাঞ্জাবের অন্তর্গত গুজরাটের শহরতলীতে পৌঁছিল, তখন তথাকার সৈয়দবৃন্দ ও মশায়েখদের একটা দল এই মর্মে সাহায্য প্রার্থনা করলেন যে, কিছু সংখ্যক দুরাচার কাফের সম্ভ্রান্ত ও দাসী মুসলিম নারীদেরকে অপহরণ করেছে এবং তাদের অনেকে মসজিদ-গুলোকেও জোরপূর্বক বাসগৃহে পরিণত করেছে। শায়খ মাহমুদ গুজরাটীকে, যিনি একজন শিক্ষিত ও জ্ঞানবান ব্যক্তি ছিলেন এবং নবদীক্ষিত মুসলিমদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন, তাঁকে এই কার্যে নিয়োগ করা হল যেন তিনি উপযুক্ত প্রমাণাদির সাহায্যে কাফেরদের কবল থেকে মুসলিম মহিলাদেরকে উদ্ধার করেন এবং ঐ সকল মালাউনদের হাত থেকে মসজিদগুলোকেও মুক্ত করেন। এই হুকুম মোতাবেক তিনি ৭০ জন সম্ভ্রান্ত ও দাসী মুসলিম স্ত্রীলোককে উদ্ধার করেছিলেন। হিন্দুরা যেখানেই মসজিদগুলোকে দখল করে নিয়েছিল, অনুসন্ধান করবার পর সেগুলোকেও তিনি খালি করে নিয়েছিলেন। সেখান থেকে কিছু কিছু জরিমানা আদায় করে মসজিদ-গুলোর সংস্কার সাধনপূর্বক পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে এনেছিলেন। এই বার্তা যখন বাদশার কর্ণগোচর হল, তখন এই মর্মে বাদশাহর আদেশ জারী হল যে, মুসলমান মাত্রেই যেন ঐ সকল মুসলিম মহিলাদের নূতনভাবে বিবাহসূত্রে গ্রহণ করেন। বাদশাহের দরবার থেকে যখন এই আদেশ জারী হল, তখন কতকগুলো নেক লোক ইসলামের মর্যাদা রক্ষাকল্পে মুসলিম মহিলাদেরকে পুনরায় বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করলেন। আরও আদেশ হল যে, সমগ্র সাম্রাজ্যের মধ্যে যেখানেই এইরূপ ঘটনা ঘটেছে, সেখানেই এই হুকুম প্রতিপালিত হবে। এরই ফলস্বরূপ বহুসংখ্যক মুসলিম নারী কাফেরদের কবল থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত হয় এবং মুসলমানদের সঙ্গে তাদের বিয়ে হয়। অধিকন্তু কাফেরদেরও কিছু সংখ্যক লোক সত্যধর্ম গ্রহণ করে দোজখের আগুন থেকে রক্ষা পেল। মসজিদ ভেঙ্গে স্থাপিত মন্দিরগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হল ও তথায় মসজিদ গড়ে উঠল।" (শাজাহান নামা, কলিকাতায় ছাপা, ২য় খণ্ড, অভিষেক বর্ষের ঘটনাবলী, পৃঃ ৫৭ ও ৫৮। এতে যে সকল মন্দির ভেঙ্গে ফেলার উল্লেখ আছে, তা ঐ সকল মন্দির বা মসজিদ ছিল এবং হিন্দুরা ভেঙ্গে ফেলে মন্দিরে রূপান্তরিত করেছিল)।

এই সকল ঘটনাবলীর প্রতি লক্ষ্য করুন এবং বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে চিন্তা করুন। দেখতে পাবেন, শাজাহান একজন তেজঃবীর্য মুসলমান ছিলেন এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাঁর এই ইসলামী জোশ প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর রাজ্যাভিষেক বর্ষে বেনারসের নবনির্মিত মন্দিরগুলো তিনি ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও হিন্দুরা এত প্রবল হয়ে উঠেছিল যে বলপূর্বক মুসলিম মহিলাদেরকে ঘরে আবদ্ধ করে রাখত এবং বিয়ে করত। মসজিদগুলোকে ভেঙ্গে ফেলে মন্দির ও জনসাধারণের বাসগৃহে পরিণত করত। শাজাহান যখন জানতে পারলেন তখন তিনি সাধারণভাবে কোন শাস্তির ব্যবস্থা করলেন না। শুধুমাত্র মহিলাদের উদ্ধার করে আসলেন এবং যে মসজিদগুলো ভেঙ্গে হিন্দুরা মন্দিরে রূপান্তরিত করেছিল সেগুলো আবার পূর্ববৎ মসজিদরূপে বহাল করলেন।

শাহজাহান যতদিন প্রবল পরাক্রমের সঙ্গে শাসনকার্য পরিচালনা করছিলেন ততদিন হিন্দুদের অত্যাচার বন্ধ ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমস্ত ক্ষমতা শাজাহানের হাত থেকে দারাশেকোর হাতে চলে গেল। অথচ দারাশেকোর চালচলন এমন ছিল যে, প্রকাশ্যভাবে তিনি হিন্দুয়ানী চালেই চলতেন। উপনিষদের যে অনুবাদ তিনি প্রকাশ করেছেন তাতে পরিষ্কার ভাষায় লিখেছেন যে, কোরআন শরীফ আসলে উপনিষদ গ্রন্থ। তাঁর অনুবাদ নিম্নরূপ :

"এর সারমর্ম এই যে, পুরাণ গ্রন্থ নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঐশী-গ্রন্থ এবং তৌহিদের উৎপত্তিস্থল। এর শাশ্বত বাণী এই যে, পবিত্র কোরআন এমন একটা গ্রন্থের মধ্যে সুরক্ষিত রয়েছে যা গুপ্ত ; কেউ তা স্পর্শ করতে পারে না ; কিন্তু কেবলমাত্র তাঁরাই পারেন যাঁদের অন্তর পবিত্র। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রভুর নিকট থেকে এই গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে।" অর্থাৎ কোরআনে কারীম এমন একটা গ্রন্থের ভিতরে নিহিত আছে যে গ্রন্থখানা গুপ্ত এবং কেবলমাত্র যার অন্তঃকরণ পবিত্র সে-ই স্পর্শ করতে পারে। ইহা আল্লাহ পাকের কাছ থেকে নাজেল হয়েছে। এতে স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে যে, এই আয়েতগুলো জবুর, তওরাত ও ইঞ্জিল কেতাবাদি সম্পর্কে বলা হয়নি। উপনিষদ যেহেতু একটা মস্তকাবৃত ও গুপ্ত গ্রন্থ, সুতরাং এটাই ঐ মূল ঐশী গ্রন্থ। বিশেষতঃ

কোরআন শরীফের আয়েতগুলোও অবিকল তাতে পাওয়া যায়। অতএব ঐ গুপ্ত গ্রন্থখানা নিশ্চয়ই পুরান গ্রন্থ।"

এখন চিন্তা করুন, সেই হিন্দুরা যাদেরকে আকবর রাষ্ট্রের অংশীদার করে তুলেছিলেন, জাহাঙ্গীরের আমলে যারা মুসলমানের অর্থে মন্দির নির্মাণ করত, শা'জাহানের রাজত্বকালে যারা মসজিদ ভেঙ্গে ফেলে সে-স্থলে মন্দির প্রস্তুত করত, মুসলিম নারীদেরকে যারা জোরপূর্বক গৃহে আবদ্ধ করে রাখত ও বিয়ে করত, নিজেদের পাঠশালায় যারা মুসলিম শিশুদেরকে হিন্দুধর্ম শিক্ষা দিত এবং স্বয়ং আলমগীরের রাজত্বকালেও তাঁর সিংহাসনারোহণের দ্বাদশ বর্ষ পর্যন্ত যখন এই অবস্থাই চলছিল (বিস্তারিত বিবরণ সম্মুখে আসবে) তখন দারাশেকোর পক্ষপুটে আশ্রয়লাভের পর সেই হিন্দু জাতির শক্তি ও প্রতিপত্তি, বাড়াবাড়ি, জুলুম, অত্যাচার ও অনাচারের ব্যারোমিটার কত ডিগ্রী পর্যন্ত উঠে গিয়েছিল তা কল্পনা করা যায় কি? স্মরণ রাখতে হবে, এই হিন্দুদের সঙ্গেই আলমগীরের সংঘর্ষ বেধেছিল। এখন আমি মূল আলোচ্য বিষয়গুলোর দিকে অগ্রসর হচ্ছি।

চাকুরী থেকে হিন্দুদের অপসারণ

ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ তাঁদের চিরাচরিত অভ্যাসমত এই ঘটনার আসল রূপটাই পরিবর্তন করে ফেলেছেন। অর্থাৎ আলমগীর সমস্ত হিন্দুদের জন্য সরকারী চাকুরীর দ্বার রুদ্ধ করে দিতে চেয়েছিলেন, যদিও তা পারেননি। এলফিনিস্টন সাহেব লিখেছেন,

"এই সার্কুলারটাকেও সমস্ত হাকিম ও ক্ষমতার্পিত ব্যক্তিদের নিকট এই মর্মে প্রেরণ করেছিলেন যে, ভবিষ্যতে যেন আর কোন হিন্দুকে চাকুরীতে ভর্তি করা না হয় বরং সমস্ত পদে কেবল মুসলমানদেরকেই যেন নিযুক্ত করা হয়, যা হাতে আছে।"

কিন্তু আসল ব্যাপার শুধু এইটুকু যে, ১০৮২ হিজরীতে তিনি এই হুকুম জারী করেছিলেন যে, সুবাদার ও তায়াল্লকদারদের পেশকার ও দেওয়ান

এবং বিশেষ বিশেষ মহলের খাজানা ও ট্যাক্স আদায়কারী পদসমূহে যেন হিন্দুদেরকে নিয়োগ করা না হয়।

খাফী খাঁ লিখছেন,

"সুবাদার এবং তায়াল্লকদারগণ যেন পেশকার ও দীওয়ান পদে হিন্দুদেরকে অপসারণ করে মুসলমানদের ভর্তি করেন এবং ট্যাক্স আদায়ের জন্য বিশিষ্ট মহলগুলোতেও মুসলিম কর্মচারী নিয়োগ করেন।" (খাফী খাঁ, 'হালাতে আলমগীরি', পৃঃ ৩৫২)।

এটা সুবিদিত যে, ঐ সমস্ত পদে কায়স্থরাই অধিকাংশ নিযুক্ত হত, যারা ঘুষ গ্রহণে নামকরা ছিল। ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে বাদশার এই আদেশের কোন সম্পর্কই ছিল না। তা ছাড়া এই আদেশটাও বলবৎ রইল না। ওটাকে এমনভাবে সংশোধন করা হল যে, একজন পেশকার হিন্দু আর একজন পেশকার মুসলমান নিযুক্ত থাকবে।

খাফী খাঁ লিখছেন :

"এটাই স্থিরিকৃত হল যে, সমস্ত দীওয়ানী দফতরের পেশকার এবং সরকারের বখশী পদসমূহে একজন পেশকার মুসলমান ও একজন পেশকার হিন্দু নিয়োজিত হবে।" (খাফী খাঁ, আলমগীরি, পৃঃ ২৫২)।

এই ব্যবস্থা গ্রহণের পশ্চাতে হিন্দুদের ঘুষ গ্রহণ ও অসদুপায় অবলম্বনের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করা ছাড়া আর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে? অন্যথায় সামাজিক রেষারেষিই যদি এর কারণ হত তাহলে হিন্দুদেরকে যুক্তভাবে নিয়োগ করবার অর্থ কি? এই আলোচনা যদিও এখানেই শেষ হয়ে যেতে পারত, কিন্তু ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ যেহেতু সমস্বরে এই ঘটনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন, আমি প্রয়োজনবোধে হিন্দু কর্মচারীদের একটা তালিকা পেশ করছি। এতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখা উচিত :

১। এই তালিকাটা সরাসরি মাসেরে আলমগীরি থেকে গৃহীত হয়েছে, যা আলমগীরের জীবনের সর্বাগ্রগণ্য ইতিহাস।

২। শুধুমাত্র ঐ সকল কর্মচারীদেরকেই এই তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, যাঁরা উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সাধারণ পদাধিকারীদের ও সেনানায়কদের নাম এতে সন্নিবেশিত হয়নি।

৩। শুধু সেই সকল কর্মচারীদেরকেই তালিকাভুক্ত করা হয়েছে যাঁরা আলমগীরের তথাকথিত 'বিদ্বেষ' প্রচারিত হওয়ার পর নিযুক্ত হয়েছিলেন। অথবা তার পরবর্তীকাল পর্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন।

৪। ঐ সকল পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের অধিকাংশই মারহাট্টাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, আকবরের রাজত্বকালে যেমন হিন্দুরা মুসলমানদের পক্ষ হয়ে স্বধর্মাবলম্বী হিন্দুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন, ঠিক তেমনিভাবে আলমগীরের রাজত্বকাল পর্যন্তও ঐ অবস্থা বিরাজিত ছিল।

৫। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ অবৈতনিক অফিসারও ছিলেন। গৌরব-জনক মনে করে তাঁরা এটা গ্রহণ করতেন।

পদধারীর নাম	পিতৃ পরিচয় ইত্যাদি	নিয়োগের তারিখ, পদোন্নতি অথবা মনসব প্রাপ্তি (সন বলতে আলমগীরের জলুশ বুঝায়)
১। রাজা ভীম সিং	উদয়পুরের মহারানা রাজসিংহের পুত্র ও মহারানা জয়সিংহের ভ্রাতা।	আলমগীরের ৩১তম অভিষেক বর্ষে দাক্ষিণাত্য থেকে এসে-ছিলেন এবং বুরহানপুরের অভি-যানে যোগাদন করেছিলেন ও ৩৮তম বর্ষে ৫ হাজারী মনসবে পৌঁছে মারা যান।
২। ইন্দ্র সিং	মহারানা জয়সিংহের ভ্রাতা।	৪৩তম অভিষেক বর্ষে ২ হাজারী হন, ৪৮তম বর্ষে ৩ হাজারীতে পৌঁছেন।
৩। বাহাদুর সিং	মহারানা জয়সিংহের ভ্রাতা।	৪৩তম অভিষেক বর্ষে দেড় হাজারী মনসব প্রাপ্ত হন।
৪। রাজা মানসিং	রাজা রূপসিংহের পুত্র	২৬তম অভিষেক বর্ষে মান্দেজ-পুর ও বদনুরের ফৌজদার নিযুক্ত

		হন। (উদয়পুরের মহারানা এই পরগণাগুর জিজিয়ার পরিবর্তে দিয়েছিলেন)।
৫। আচলাজি	শিবাজীর জামাতা	৪০তম অভিষেক বর্ষে ৩ হাজারী পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন।
৬। আরজুজী	শিবাজীর পুত্র শম্ভার চাচাত ভাই।	৪২তম অভিষেক বর্ষে ৫ হাজারী মনসব ও পতাকা, নাকাড়া ইত্যাদি লাভ করেন।
৭। আরজুজী	শম্ভার ভৃত্যদের একজন	৩৮তম অভিষেক বর্ষে ২ হাজারী মনসাব।
৮। মাজুজী	... ...	৩১তম অভিষেক বর্ষে ২ হাজারী মনসব।
৯। রাও অনুপ সিং	রাজা করনের পুত্র	৩১তম অভিষেক বর্ষে চাকুরীর খেলাত প্রাপ্ত হন।
১০। রাজা অনুপ সিং	... ...	৩১তম অভিষেক বর্ষে শক্করের কেল্লাদার নিযুক্ত হন।
১১। রাজা উদিরাত সিং	... ...	৩৬তম অভিষেক বর্ষে ইরাজের ফৌজদার এবং ২½ হাজারী হন।
১২। উদয় সিং	খেলনা কেল্লার কেল্লাদার ছিলেন।	৪৭তম অভিষেক বর্ষে ৩½ হাজারী হন।
১৩। বাসদেব সিং	জম্মন কারার জমিদার	৪৯তম অভিষেক বর্ষে ৩ হাজারী হন।
১৪। কাথুজী		প্রথম ৬ হাজারী ছিলেন, ৪৯তম অভিষেক বর্ষে ১হাজার বর্ধিত হন।
১৫। হররহাল বুন্দিয়া		৪৪তম অভিষেক বর্ষে তারাকেল্লার কেল্লাদার হন।

১৬। বসন সিং	কুমার কিশান সিংহের-পুত্র, তিনি রাজা রাম সিংহের পুত্র।	২৫তম অভিষেক বর্ষে ১ হাজারী ও ৪ শত অশ্বারোহী প্রাপ্ত হন।
১৭। রাম চাঁদ	কাহতালুনের থানাদার	৪০তম অভিষেক বর্ষে আড়াই হাজারী পান।
১৮। লোক চাঁদ	শাহজাদা আজমের নায়েব ও কর্মচারী ছিলেন।	২৯তম অভিষেক বর্ষে বাহাদুর শাহকে পরাজিত করার পুরস্কার-স্বরূপ রায় রাইয়ান খেতাব পান।
১৯। ভাগু বনজারা	... ...	৪২তম অভিষেক বর্ষে পাঁচ হাজারী মনসব।
২০। জাকিয়া	... ...	৫০তম অভিষেক বর্ষে ৩ হাজারী।
২১। দুর্গাদাস রাঠুর	... ...	২৯তম অভিষেক বর্ষে ৩ হাজারী মনসবে পুনর্বহাল হন।
২২। রূপ সিং	রাজা অদোত সিং-এর পুত্র।	৪১তম অভিষেক বর্ষে ১ হাজারী হন।
২৩। সুভান	সেতারার কেল্লাদার	৪০তম অভিষেক বর্ষে ৫ হাজারী মনসব, খেলাত ও নাকাড়া প্রাপ্ত হন।
২৪। শিব সিং	রাহেরীর কেল্লাদার	৪৭তম অভিষেক বর্ষে দেড় হাজারী হন।
২৫। আম্বাতা	রাও কাথুর পুত্র ও নসরত জঙ্গের ফৌজে নিযুক্ত।	৫১তম অভিষেক বর্ষে মাহ-মানাত দুর্গ অধিকার করণার্থ নিযুক্ত হন।
২৬। কিশোর দাস	মনোহর দাস গৌরের পুত্র।	২৬তম অভিষেক বর্ষে সোনা-পুরের কেল্লাদার হন।
২৭। রাজা কুলিয়ান সিং	ভাদাওয়ের জমিদার	৪০তম অভিষেক বর্ষে দরবারে হাজির হলে ৭ শতের উপর আরও ২ শত প্রাপ্ত হন।

এই তালিকার আরও কয়টি বিষয় লক্ষণীয়। সর্বাগ্রে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, উদয়পুরের মহারানার পুত্র ও ভ্রাতাও এই তালিকায় স্থান পেয়েছে। তদপেক্ষাও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, শিবাজীর কতিপয় স্নেহভাজন ও আত্মীয়-স্বজনের নামও এতে পাওয়া যাচ্ছে। ইতিহাস পাঠ করুন, বুঝতে পারবেন যে, এঁরা শুধুনাম মাত্র পদধারী ছিলেন না। বরং মরণপণ করে যুদ্ধ করতেন। এদের মধ্যে সকল রকম পদের লোকই ছিলেন। অর্থাৎ সৈন্য বিভাগেরও ছিলেন, শাসন বিভাগেরও ছিলেন। চিন্তা করে দেখুন, সৈন্যদলের নেতৃত্ব, কেল্লার কেল্লাদারী, জেলাসমূহের নাজেমের পদ ও ফৌজদারী ইত্যাদি অপেক্ষা অধিকতর দায়িত্বপূর্ণ ও নির্ভরশীল পদ আর কি হতে পারে? অথচ এ সমস্ত দায়িত্বশীল পদে হিন্দুরা অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সমুদয় ঘটনাবলীর পর্যালোচনার পর লেনপুল সাহেবের বাণীর প্রতি আর একবার দৃষ্টিপাত করুন, তিনি বলেন,

"রাজপুতগণ আলমগীরের সাহায্যকল্পে একটা অঙ্গুলি প্রদর্শন করতেও ইচ্ছা করেনি।"

জিজিয়া প্রবর্তন

যেহেতু জনসাধারণ জিজিয়ার প্রকৃত ও অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য অবগত নন, সেহেতু আলমগীরের প্রতি এই দোষ আরোপ করা হয়ে থাকে। জিজিয়া সম্পর্কে আমি একখানা স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করে তাতে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। ইংরেজীতে তার অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে। তা পাঠ করলে বুঝতে পারা যাবে যে, জিজিয়া কোন অপ্রিয় বস্তু নয়। বরং অমুসলমানদের জন্য কল্যাণকর। তবু অস্বীকার করে লাভ নেই যে, হিন্দুগণ এতে মনঃক্ষুন্ন। কারণ, দীর্ঘকাল ধরে যে কর রহিত হয়ে গিয়েছিল পুনরায় তার প্রবর্তন কি করে তারা পছন্দ করতে পারে?

মেলা অনুষ্ঠানাদি বন্ধকরণ

স্বীকার করতে আপত্তি নেই যে, আলমগীর একজন নিতান্ত নীরস লোক ছিলেন। মেলা, নৃত্যগীত, বাদ্য, শরাব ও কবাব এবং সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা

ও বাহ্যাড়ম্বরের প্রতি স্বাভাবিকভাবেই তাঁর ঘৃণা ছিল। তিনি জানতেন যে, এই সকল কারণে নৈতিক চরিত্রের উপর অত্যন্ত অশুভ প্রতিক্রিয়া ঘটে। গৃহবিবাদের হাত থেকে মুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি এদিকে মনোনিবেশ করলেন।

তৈমুরী সুলতানদের প্রচলিত আইনানুসারে বিখ্যাত গায়কগণ রাজ-দরবারে চাকুরী লাভ করতেন। বাদশাও চিত্তবিনোদন হেতু প্রত্যহ একটা নির্দিষ্ট সময় ঐ আমোদে ব্যয় করতেন। অনুরূপভাবে দরবারে কবি ও জ্যোতিষীগণও চাকুরী করতেন। ১১৭৮ হিজরীতে আলমগীর এক আদেশ জারি করলেন যে, গায়কগণ দরবারে যোগ দিতে পারবেন, কিন্তু গাইতে পারবেন না। এরপর গানবাদ্য একদম বন্ধ করে দিলেন। সভা-কবির পদ লোপ করে দিলেন এবং জ্যোতিষীদেরও বিদায় করে দিলেন। দরবারে আদাব ও কুর্ণিশের যে প্রথা ছিল, তা রহিত করে দিলেন। পূর্ববর্তী বাদশাহগণ ঝরকায় বসে প্রজাবৃন্দকে দর্শন দান করতেন। এর ফলে একটা খাস দর্শনী-দলের সৃষ্টি হয়েছিল। তারা রাজদর্শন ব্যতিরেকে আদৌ পানাহার করত না। রাষ্ট্র পরিচালনার পক্ষে যদিও এই প্রথা মঙ্গলকর ছিল, তবু তিনি এর উচ্ছেদ সাধন করলেন। পবিত্র মহররম উপলক্ষে তাবুত বের করা হত ; কিন্তু ১০৭৯ হিজরী সনে বুরহানপুরে এই তাবুত বের করা হয়। ফলে দুটো দলের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে এক গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। পরিণামে বিরাট হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। এ সংবাদ শুনে সম্রাট এক আদেশ দ্বারা তাবুত বের করা অতঃপর নিষিদ্ধ করে দিলেন। (খাফী খাঁ এ ঘটনাকে বিস্তৃতভাবে লিখেছেন, পৃঃ ২১৩-২১৪)। এই হট্টগোলে হিন্দুদের মেলা ইত্যাদিও বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু বিদ্বেষদুষ্ট ঐতিহাসিকের দল প্রচার করে বসলেন যে, তিনি সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই এরূপ করেছেন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ করে দেওয়া

ইরানী ঐতিহাসিকেরা যাঁরা আলমগীরের প্রত্যেকটা কাজেই দোষ ধরে থাকেন, তাঁরা বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলোকেও সাধারণ পর্যায়ে দেখাতে

অভ্যস্ত। আপনারা ইতিপূর্বে পাঠ করে এসেছেন যে, শাজাহানের রাজত্ব-কালে হিন্দু জনসাধারণ মুসলমানদের উপর সাম্প্রদায়িক অত্যাচার শুরু করে দিয়েছিল। বিশেষতঃ দারাশেকোর কার্যপদ্ধতি তাদের সাহস আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। তাদের পাঠশালাসমূহে পর্যন্ত মুসলমান শিশুদেরকে তাদের ধর্মীয় বিদ্যা শিক্ষা দিত। অধিকন্তু এমন উৎসাহ দান করত যে, দূর-দূরান্তর থেকে মুসলমানগণ তাদের মাদ্রাসায় ও পাঠশালায় বিদ্যার্জন করতে আসত। এই ধরনের বিদ্যালয়গুলোই আলমগীর বন্ধ করে দিয়েছিলেন। অথচ, বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন ঐতিহাসিকগণ লিখে গেছেন যে, তিনি হিন্দুদের সমস্ত শিক্ষালয় ও উপাসনালয়গুলোই ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। তবু তাঁদেরই লেখার মধ্যে প্রকৃত তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। 'মাসেরে আলমগীরি'তে এই ঘটনাটাকে লেখা হয়েছে :

"ধর্মপ্রাণ সম্রাট জানতে পারলেন যে, থাট্টা ও মুলতান সুবায় বিশেষতঃ বেনারসে মিথ্যাচারী ব্রাহ্মণের দল অলীক গ্রন্থাদি স্কুলসমূহে পড়াতে লেগে গিয়েছে। হিন্দু ও মুসলিম বিদ্যার্থীরা বহু দূরবর্তী পথ অতিক্রম করে উক্ত অভিশপ্ত বিদ্যা অর্জনকল্পে ঐ ভ্রষ্টদলের নিকট আগমন করে। সুতরাং সমস্ত সুবার শাসনকর্তাদের নিকট আদেশ প্রেরণ করা হল যে, তাঁরা যেন ঐ বেদীনদের বিদ্যালয় ও উপাসনালয়গুলো স্বহস্তে ভেঙ্গে দেন এবং বিধর্মীদের শিক্ষা-দীক্ষা ও কুফরী চালচলন সত্যি সত্যি উচ্ছেদ করেন।" (পৃঃ ৮১)।

উক্ত বিবৃতি থেকেই বুঝতে পারা যাবে যে, কি কি কারণে এই আদেশ দেওয়া হয়েছিল এবং এর উদ্দেশ্য কি ছিল। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, হিংসুক ঐতিহাসিকরা এই বিশেষ আদেশটাকে সাধারণ আদেশের পর্যায়ে প্রচার করেছেন। অবশ্য এটা তাঁদের চিরন্তন অভ্যাস। পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, আলমগীর কতিপয় বিশেষ বিশেষ চাকুরী হিন্দুদের জন্য নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। অথচ এই ঐতিহাসিক প্রবর বলছেন যে, শিক্ষিত হিন্দু মাত্রেই বঞ্চিত হয়েছিল। যেমন, তিনি তাঁর গ্রন্থের পরিশিষ্টে লিখেছেন, "হিন্দু শিক্ষিতগণ একদম চাকুরী থেকে বঞ্চিত ছিল।" (পৃঃ ৫২৮)। পরবর্তী ঐতিহাসিকেরা অবশ্য একথা বিশ্বাস করেননি। খাফী খাঁ যদিও আলমগীরের হিন্দু-বিরোধী

নির্দেশগুলোকে প্রাণ খুলে লিখেছেন, কিন্তু এ বিষয়টার কোনই আলোচনা করেননি।

মূর্তি ভঙ্গ করা

আলমগীরের প্রতি আরোপিত কলঙ্ক-তালিকায় এটাই সবচেয়ে বড় বড় অক্ষরে ছাপা হয়ে থাকে। এতে সন্দেহ নেই যে, আলমগীর যদি শান্তি স্থাপিত অবস্থায় আপন প্রজাবৃন্দের উপাসনালয় ধ্বংস করে থাকেন, তা'হলে তিনি ইসলামের মূল শিক্ষাই বুঝতে পারেননি। খুলাফায়ে রাশেদীন অপেক্ষা দীনে ইসলামের কে আর বড় পৃষ্ঠপোষক হতে পারেন? তাঁরা শত শত শহর জয় করেছেন, পৃথিবীর বিরাট বিরাট রাজ্য তাঁদের করতলগত হয়েছে। তাঁদের জীবনী ও যুদ্ধ যাহার প্রতিটি ঘটনার প্রত্যেকটা হরফ পর্যন্ত ইসলামী ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রয়েছে। অথচ এমন একটা ঘটনারও উল্লেখ নেই যে, কোথায়ও কোন মন্দির বা উপাসনালয়ে একটু ধাক্কা পর্যন্ত লেগেছে। যাহোক, এ বিষয়টা আমি 'হকুকুজ্জিম্মিয়িন' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আলমগীর যদি এ সবের অন্যথা কিছু করে থাকেন তা'হলে নিশ্চয়ই তিনি এই বিশেষ ব্যাপারে ইসলামের যোগ্য প্রতিনিধি নন। কিন্তু আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করে দেখতে হবে যে, আসলে ব্যাপারটা কি। লোকে বর্তমান যুগের সভ্যতার ও চালচলনের আলোকে অতীতকে বিচার করে স্বভাবতঃ ভুল করে থাকে। অথচ আজকাল ধর্ম ও রাজনীতি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। ইংরেজ সরকার নিঃসঙ্কোচে এর অনুমতি প্রদান করে থাকেন যে, যার ইচ্ছা মঞ্চে দাঁড়িয়ে স্বয়ং সরকার যে ধর্মাবলম্বী সেই খ্রীস্টান ধর্মের বিরুদ্ধেও প্রশ্ন ও সমালোচনা করতে পারে এবং মানুষকে স্বধর্মে আনয়ন করতে পারে। কিন্তু সেই ইংরেজ সরকার এটা কখনই স্বীকার করবে না যে, কোন ব্যক্তি জনসভায় এ সরকারের রাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করে এবং জনসাধারণকে সরকারের বিরুদ্ধাচরণকল্পে স্বমতাবলম্বী করে তুলে। আজ মুসলমানদের মসজিদ ও হিন্দুদের শিবালয়ের কোন রাষ্ট্রীয় প্রতিক্রিয়া নেই। কিন্তু প্রাচীনকালে এই সকল স্থানই বিদ্রোহ ও সংঘর্ষের কেন্দ্রস্থল ছিল। তখন এমন ছিল যে, হিন্দু ও মুসলমান যখনই যে সুযোগ পেত, একে-অপরের

উপাসনালয়ের প্রতি আঘাত হানত। সুতরাং হিন্দু রাজাগণ যখনই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে তখনই মসজিদগুলি ভেঙ্গে ধূলিসাৎ করেছে—এ ধরনের ঘটনারাজি দ্বারা ইতিহাসের পৃষ্ঠা পরিপূর্ণ।

দাক্ষিণাত্যের আলী আদেল শাহ বিজানগরের রাজা রামরাজকে ৯৭৬ হিজরীতে নিজাম শাহ বাহরীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রার জন্য স্বীয় সাহায্যার্থ আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু রামরাজ সাহায্য করতে এসে স্বয়ং আদিল শাহের রাজ্যের সমস্ত মসজিদগুলো পুড়িয়ে দিয়েছিলেন।

'তারিখে ফেরেশ্‌তা'য় লিখিত আছে :

"আলী আদিল শাহ হিজরীর ৯৭৬ সালে রামরাজকে স্বীয় সাহায্যার্থ ডেকে আনলেন। তার সঙ্গে পরামর্শ করে প্রয়োজন বোধে যখন তিনি (আলী আদেল শাহ) আহমদ নগরে আত্মগোপন করলেন তখন পুরন্দা থেকে খবীর পর্যন্ত এবং আহমদ নগর থেকে দৌলতাবাদ পর্যন্ত কোথায়ও বসবাসের কোন চিহ্ন রইল না। বিজানগরের হিন্দুগণ যারা দীর্ঘকাল ধরে এরূপ সুযোগের অপেক্ষা করছিল, অত্যাচারের হস্ত প্রসারিত করে সমস্ত মসজিদ ও কোরআন শরীফ পুড়িয়ে ফেলল।" তারিখে ফেরেশ্‌তা, নলকিশোর ছাপা, ২য় খণ্ড, পৃঃ, ৩৬)।

উক্ত ঐতিহাসিক মহোদয় এই ঘটনাটা অন্য এক স্থানে আরও বিস্তারিত-ভাবে লিখেছেন। অর্থাৎ আলী আদেল শাহ রামরাজকে স্বীয় সাহায্যার্থ এই শর্তে ডেকেছিলেন যে, অমুসলমানগণ যেন মসজিদ ইত্যাদির অবমাননা না করে। তা' সত্ত্বেও তারা তার উল্টা করেছে। তাঁর ইতিহাসের মূল ভাষা নিম্নরূপ :

"নেজাম শাহ বাহরীর সঙ্গে যুদ্ধে বিরত হয়ে পড়ায় আলী আদেল শাহ প্রথমবার যখন অনন্যোপায়ে রামরাজকে সাহায্যের জন্য ডাকলেন, তখন তাঁদের মধ্যে শর্ত ধার্য হল এই যে, বিজানগরের হিন্দুগণ সাম্প্রদায়িক শত্রুতাহেতু মুসলমানদের প্রাণহানিকর, লুটপাট ও গ্রেপ্তারমূলক কোন কাজ করবে না এবং মসজিদগুলোর কোন ক্ষতি করবে না। কিন্তু কার্যতঃ তারা এর বিপরীত ব্যবহার প্রদর্শন করেছিল। পাষণ্ড কাফেরগণ আহমদ নগরের মসজিদগুলো ধ্বংস, মুসলমানদের উপর অত্যাচার এবং তাদের

মান-ইজ্জত বিনষ্ট করতে চেষ্টার কোন ক্রটি করেনি। এও জানা গেছে যে, তারা মসজিদে প্রবেশ করে প্রতিমা পূজা করত ও বাদ্য বাজিয়ে গান গাইত।" (২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭)।

এই ধরনের বহু ঘটনা বিদ্যমান, যার বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। আপনারা পূর্বেই জানতে পেরেছেন যে, হিন্দুরা আলমগীরের রাজত্বলাভের পূর্বে কিরূপ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। তিনি যখন তাদের অত্যাচার বন্ধ করতে উদ্যত হলেন, তখন তাদের মধ্যে সর্বত্র বিদ্রোহ দেখা দিল। ১০৮৯ হিজরীর জিলকদ মাসে তাঁর রাজ্যাভিষেকের দ্বাদশ বর্ষে আলমগীর যখন অবগত হতে পারলেন যে, হিন্দুরা মুসলমান শিশুদেরকে তাদের সাম্প্রদায়িক বিদ্যা শিক্ষা দিচ্ছে, তিনি তা বন্ধ করে দেবার আদেশ দিলেন। এই ঘটনার মাত্র মাসখানেক পর মথুরা অঞ্চলে হিন্দুরা বিদ্রোহ শুরু করে দিল। ঐ বিদ্রোহ দমনকল্পে আবদুন্নবী খাঁ মথুরার ফৌজদার নিযুক্ত হলেন ও নিহত হলেন (মাসেরে আলমগীরি)। এরই নিকটবর্তী কোন এক সময়ে অর্থাৎ ১০৮০ হিজরী সালে বেনারসের মন্দির, কাশীনাথ ও মথুরার সেই মন্দির যা আবুল ফজলের লুণ্ঠিত ধনে নরসিং দেব নির্মাণ করেছিল তা ভেঙ্গে দেয়া হল। এরপর উদয়পুর ইত্যাদি স্থানগুলোর মন্দিরসমূহের উপর হস্তক্ষেপ করা হ'ল।

ইরানী বিরোধীদলীয় ঐতিহাসিকদের কি উদ্দেশ্য ছিল যে তাঁরা মন্দির ধ্বংসের কারণগুলো আবিষ্কার করতে বসেছেন? নিম্নলিখিত ঘটনাবলী আজও সর্বজনবিদিত। এইগুলোকে দার্শনিক ভিত্তিতে সজ্জিত করুন, তাহলে প্রকৃত তথ্য পরিষ্কার বের হয়ে আসবে ঃ

(১) শা'জাহানের রাজত্বকালের ৭ম বর্ষ পর্যন্ত হিন্দুরা এত প্রবল ছিল যে, মসজিদগুলোকে ভেঙ্গে নিজেদের বসবাসের কাজে ব্যবহার করত এবং মুসলিম ভদ্রমহিলাদের বলপূর্বক ঘরে আটকে রেখে বিয়ে করত।

(২) দারাশেকো, যিনি শা'জাহানের জীবনের শেষভাগে সাম্রাজ্যের কর্তা হয়ে পড়েছিলেন, তিনি আপাদমস্তক হিন্দুভাবাপন্ন ছিলেন।

(৩) আলমগীরের দ্বাদশ বর্ষ রাজত্বকাল পর্যন্ত হিন্দুদের অবস্থা এমন ছিল যে, তারা প্রকাশ্যভাবে মুসলমানদেরকে তাদের সাম্প্রদায়িক বিদ্যা শিক্ষা দিত।

(৪) আলমগীর যখন এই শিক্ষা বন্ধ করে দিতে প্রস্তুত হলেন, তখন হিন্দুদের ভিতরে বিদ্রোহ শুরু হল।

১০৮৯ হিজরী মোতাবেক আলমগীরের দ্বাদশ অভিষেক বর্ষে খান্দেলার রাজপুতেরা বিদ্রোহ করে এবং তাদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করা হয় ও সেখানকার মন্দির ভেঙ্গে দেওয়া হয়। ঐ বৎসরেই সর্বসাধারণের মধ্যে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে এবং যোধপুর ও উদয়পুর রাজ্যদ্বয় তার কেন্দ্রে পরিণত হয়।

(৫) এই কারণেই আলমগীর যোধপুর ও উদয়পুরের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন এবং সেখানকার মন্দিরগুলো বিধ্বস্ত করে ফেলেন।

যতগুলো মন্দির ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল তা সমস্তই ঐ সকল জায়গার মন্দির ছিল, যে সকল জায়গায় বিদ্রোহ অত্যন্ত প্রবল আকারে দেখা দিয়েছিল।

আলমগীর দীর্ঘ ২৫ বৎসর কাল দাক্ষিণাত্যে অবস্থান করেছিলেন। ওখানকার রাজ্যগুলোতে হাজার হাজার মন্দির ছিল। কিন্তু কোন ইতিহাসে ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ নেই যে, সে-দেশের কোন একটা মন্দিরও তিনি স্পর্শ করেছেন। আলোয়ারার বিখ্যাত মন্দিরে শত শত প্রতিমূর্তি ও প্রতিমা রয়েছে। এই আলোয়ারার দুই মাইলের মধ্যেই আলমগীর চিরশয্যায় শায়িত রয়েছেন। বড় বড় অলি-আউলিয়াদের মাজারও এখানে অবস্থিত, যাঁরা আলমগীরের বহু পূর্বেই ইহলোক ত্যাগ করেছেন। কিন্তু তা' সত্ত্বেও ঐ সকল প্রতিমা ও প্রতিমূর্তি অদ্যাবধি সেখানে বিদ্যমান আছে। 'মাসেরে আলমগীরি'র গ্রন্থকার যিনি স্বয়ং আলমগীরের একজন কর্মচারী ছিলেন, তিনি মন্দির ভাঙ্গার বর্ণনায় আনন্দ বোধ করতেন ও উল্লাসের সঙ্গে বর্ণনা করতেন, তিনিই কিন্তু আলোয়ারার বর্ণনা উচ্ছ্বসিত প্রশংসার সঙ্গে করেছেন। তিনি এর শেষের দিকে লিখেছেন :

"এটা একটা চমৎকার ও মনোহর ভ্রমণস্থল। স্বচক্ষে দর্শন করা ব্যতীত এর প্রকৃত বর্ণনা প্রদান করা লেখনীর পক্ষে সম্ভবপর নয়। কাগজের পৃষ্ঠায় কাহাঁতক লিখে শেষ করা যেতে পারে ?" (পৃঃ ২০৮)।

ইউরোপীয় ও হিন্দু ঐতিহাসিকের দল বলেন যে, আলমগীর মন্দির ধ্বংস করেছিলেন বলেই বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু সত্য কথা এই যে,

বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল বলেই মন্দির ধ্বংস করা হয়েছিল। আলমগীরের মন্দির ধ্বংস করা ঐ রকমই ছিল যেমন নাকি আধুনিক কালের এই আলোক-প্রাপ্ত জামানাতেও মাহদী সুদানীর সমাধি ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে।

অভিষেকের ৫ম বর্ষে যখন হিন্দুস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল এবং আলমগীর দাক্ষিণাত্যে চলে গিয়েছিলেন, তখন সেই শান্তিপূর্ণ সময়ে মন্দির ভেঙ্গে দেবার একটা প্রমাণও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় খুঁজে পাওয়া যায় না। দাক্ষিণাত্যের মুসলিম রাজ্যগুলির সঙ্গে অর্থাৎ গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের সঙ্গে অন্যান্য রাজ্যের বিরোধ ছিল। সেইজন্য কোন মন্দিরের সঙ্গেই তাঁরা বিরোধিতা করেননি। অন্যথায় যদি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষই হত, তা'হলে এখানে তার সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত স্থান ছিল।

প্রতিপক্ষ দলের মতে, আলমগীর তো বিদ্বেষপরায়ণই ছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ও নিরপেক্ষ বাদশাহ শাজাহানকেও এমতাবস্থায় আলমগীর সাজতে হয়েছিল। 'শাজাহান নামা' গ্রন্থে, যা আবদুল হামিদ লাহোরী স্বয়ং শাজাহানের তত্ত্বাবধানে লিখেছেন, তাতে এই ঘটনা নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে :

"ইতিপূর্বে যখন সম্রাটের গোচরীভূত হয়েছিল যে, মরহুম সম্রাটের (জাহাঙ্গীরের) রাজত্বকালে কুফরী ও গুমরাহীর উৎপত্তিস্থল এবং ধ্বংস ও বিনাশের পথপ্রদর্শনকারী বেনারসে বহু মন্দির নির্মিত হতে গিয়ে এখনও অসমাপ্ত রয়ে গিয়েছে। কিন্তু বহু ধনাঢ্য অসভ্য বিধর্মী ঐগুলো সমাপ্ত করে দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করছে। সেমতাবস্থায় ধর্মপ্রাণ শাহানশাহ হুকুম প্রদান করেছিলেন যে, বেনারসেই হোক বা সাম্রাজ্যের অন্য কোন স্থানেই হোক, যেখানেই নতুন মন্দির স্থাপিত হতে যাবে সেগুলো ভেঙ্গে দেওয়া হবে। সুবায়ে এলাহাবাদের জনৈক ইতিহাস লেখকের লিখিত বিবৃতি মতে জানা গিয়েছে যে, একমাত্র বেনারসের ভূখণ্ডেই ৭৬টা মন্দির ভূলুণ্ঠিত হয়েছিল।" (শাজাহান নামা, কলিকাতার ছাপা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৫২, শাজাহানের ৬ষ্ঠ অভিষেক বর্ষের কাহিনী)।

শা'জাহান কোন পক্ষপাতদুষ্ট বাদশাহ ছিলেন না। কিন্তু তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, এত অধিক সংখ্যায় নতুন নতুন মন্দির বিনানুমতিতে

নির্মাণ করতে দেওয়া ঐ পর্যায়ভুক্ত হতে চলেছে, যাতে হিন্দুরা মসজিদ ও ইসলামী উপাসনালয়গুলোকে মন্দিরে রূপান্তরিত করতে সাহস করছে। এ কারণেই তিনি নবনির্মিত মন্দিরগুলো ভেঙ্গে দিয়ে হিন্দুদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মূলোচ্ছেদ করেছিলেন। আলমগীরও তাই করেছেন, বরং তদপেক্ষা কিছু কমই করেছেন। তিনি বেনারসের মাত্র একটা এবং মথুরার সেই মন্দিরটা ভেঙ্গে দিয়েছিলেন যা মুসলমানদের অর্থেই নির্মিত হয়েছিল। এই যদি অপরাধ হয়, তা'হলে এ অপরাধের হাত থেকে আলমগীরকে রক্ষা করার কোন উপায় নেই।

আওরঙ্গজেব আলমগীর
পিতা ও ভ্রাতাগণের সমস্যাবলী

আলমগীরের প্রতি আরোপিত কলঙ্কের এটাই সর্বশেষ তালিকা। কিন্তু এটাই তাঁর শুভ্র বসনাঞ্চলের সর্বাপেক্ষা কুৎসিৎ কলঙ্ক-কালিমা। অন্যান্য কলঙ্ক সম্পর্কে আলমগীরের হিতৈষী ব্যক্তি বলতে পারেন, (১) পররাজ্য অধিকার করাই যদি অপরাধ হয়, তা'হলে আলেকজাণ্ডার ও নেপোলিয়নকেই অপরাধীদের প্রথম সারিতে দাঁড় করানো উচিত, (২) মারহাট্টাদের বিদ্রোহ দমন করাই যদি অপরাধ হয়, তা'হলে দ্বিতীয় তৈমুর (ছাহেব কেরানে সানি) শাজাহানই প্রথম অপরাধী, (৩) রাজপুত রাজাগুলোর বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করাই যদি দূষণীয় হয়, তা'হলে দোষের তালিকায় মহান আকবরের নামই শীর্ষস্থানে লিখিত হওয়া উচিত। কারণ ইনিই সর্বপ্রথম জয়পুর জয়ের সঙ্কল্প করেন এবং যতদিন পর্যন্ত রাজকন্যাগণ তৈমুরী হেরেমে প্রবেশ না করেছিল, ততদিন তিনি এই সঙ্কল্প থেকে বিচ্যুত হননি।

হিন্দুদেরকে উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ পদাদিতে অধিষ্ঠিত না করাই যদি অবিচার হয় তা'হলে ইউরোপ সম্পর্কে কি মন্তব্য করা যেতে পারে, যাঁরা অদ্যাবধি স্বজাতি ব্যতীত অন্য কাউকেই মন্ত্রীত্বের বা সেনাপতিত্বের আসন প্রদান করেননি? পক্ষান্তরে, আলমগীরের হিতৈষী প্রবর এই সকল প্রশ্নেরই বা কি উত্তর দিতে পারেন, (ক) আলমগীরের বসনাঞ্চলে ভ্রাতৃহত্যার রক্তচিহ্ন নেই কি? (খ) নির্যাতিত ব্যক্তিদের মধ্যে স্বয়ং তাঁর মহান পিতা শাজাহান বন্দীশালার দুর্ভোগ ভোগ করেন নেই কি? নিশ্চয়ই আমাকে স্থির মস্তিষ্কে এবং নিরপেক্ষ নীতিতে এই সকল অপরাধের সন্ধান নিতে হবে। কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে যে, বিচারের পাল্লা যেন কোন পক্ষেই ঝুঁকে না পড়ে।

আলমগীরের জীবনী সম্পর্কে আজ বহুবিধ গ্রন্থ বিদ্যমান। কিন্তু ঐতিহাসিক নীতির দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমাকে ঐ সকল গ্রন্থের উপর নির্ভর করতে

হবে, যেগুলো আলমগীরের জীবদ্দশাতেই লিখিত হয়েছে। এই ধরনের ইতিহাসের একটা তালিকা নিয়ে দেওয়া হল।

১। 'আলমগীর নামা', কাজেম শিরাজী প্রণীত। এতে প্রথম থেকে ১০ বৎসরের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। এর মুসাবিদা স্বয়ং আলমগীরকে দেখিয়ে নেওয়া হত।

২। 'মাসেরে আলমগীরি', মস্তায়েদ খাঁ কৃত। ইনি আলমগীরের একজন কর্মচারী ছিলেন। কিন্তু তিনি প্রথম দশ বৎসরের ইতিহাস শুধু 'আলমগীর নামা'র বর্ণনা সূত্রেই লিখেছেন এবং ঐটাই সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরেছেন।

৩। 'মুনতাখাবুল্লেবাব', খাফী খাঁ কৃত। তাঁর পিতা আলমগীরের সৈন্যদলভুক্ত ছিলেন। স্বয়ং খাফী খাঁ-ও শেষের দিকে আলমগীরের অফিসিয়াল শ্রেণীভুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। এই গ্রন্থখানা আলমগীরের মৃত্যুর দশ বৎসর পর লিখিত হয়েছে। (উক্ত তিনখানা গ্রন্থই কলকাতায় মুদ্রিত হয়েছে)।

৪। 'ওয়াকেয়াতে আলমগীরি', আকেল খাঁ প্রণীত। ইনি আলমগীরের ওমরাহগণের অন্যতম ছিলেন। এই গ্রন্থখানা যদিও আলমগীরের জীবদ্দশাতেই লিখিত হয়েছে, কিন্তু তা গোপনে এবং তাঁর অজ্ঞাতে হয়েছে। খাফী খাঁ-ই একথা বলেছেন। লেখক নিতান্ত বেপরোয়াভাবে খোলাখুলি সমস্ত ইতিহাস লিখেছেন।

৫। 'সফর নামা', ডাঃ বার্নিয়ার প্রণীত। তিনি তাঁর স্বচক্ষে দেখা ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করেছেন।

৬। 'ফাইয়াজুল কাওয়ানিন'। এতে হিন্দুস্তান ও ইরানের সুলতানগণ এবং মির্জা মুরাদ, শুজা, আলমগীর ও তৈমুরী উমারাগণের চিঠিপত্রাদি আছে। এগুলো মির্জা মুরাদের ঐ সময়ের চিঠিপত্র, যখন তিনি আলমগীরের সঙ্গে মিলিতভাবে দারাশেকোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রার আয়োজন করছিলেন। এই সকল পত্র ও ফরমান ১১৩৪ হিজরী সালে মোল্লা ফাইয়াজ সংগ্রহ করেছিলেন। এর পাণ্ডুলিপি আমার বন্ধু নওয়াব হাসান আলী খাঁর লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে।

এর মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রন্থে যদিও বিস্তারিত ইতিহাস বর্ণিত আছে এবং আলমগীরের অনুকূলে ওগুলো অধিকতর প্রয়োজনীয়; কিন্তু তথাপি ও থেকে আমি ইতিহাসের সূত্র গ্রহণ করতে পারিনে। কারণ, 'আলমগীর-নামা' যদিও প্রায় আলমগীরেরই রচিত এবং মাসেরের ঐ অংশটুকু, যাতে বিতর্কমূলক ঘটনাসমূহ রয়েছে, তা খোদ 'আলমগীর নামা' থেকেই সংগৃহীত হয়েছে। উল্লিখিত গ্রন্থগুলো থেকে আমি শুধু ঐ সকল ব্যাপারে সূত্র গ্রহণ করব যেক্ষেত্রে অন্যান্য ঐতিহাসিকেরাও তাঁদের সাথে একমত। শিয়া ও সুন্নীদের বিভেদ সৃষ্টি করা আমার নিকট অত্যন্ত অপ্রিয়। জাতির ঐ সকল শত্রুকে আমি অতিশয় নীচ প্রকৃতির মনে করি, যারা মুসলিম দলগুলোর পরস্পরের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টি করে। এমনকি অনেকে একে জীবিকা উপার্জনের উপায়-রূপেও গ্রহণ করেছে। কিন্তু ঐতিহাসিকতার কর্তব্যবোধে আমি লিখতে বাধ্য হচ্ছি যে, আলমগীর সুন্নী ছিলেন, পক্ষান্তরে তাঁর সমস্ত জীবনী লেখক-গণই যথা, নেয়ামত খাঁ, কাজেম শিরাজী, আকেল খাঁ ও খাফী খাঁ, সকলেই শিয়া ছিলেন। এসব বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে, ঐ সকল ঐতিহাসিকদের বর্ণনা দলগত পার্থক্যের হেতু বিশ্বাসযোগ্য নয়। বরং উদ্দেশ্য এই যে, দলীয় পার্থক্যের প্রতিক্রিয়া এশীয় ঐতিহাসিকদের মনের উপর আপনা-আপনি এসে পড়ে। আসল কথা হল, ইউরোপের ঐতিহাসিকরাও এ প্রতিক্রিয়ার দায় থেকে মুক্ত নন। তফাৎ শুধু এইটুকু যে, ইউরোপীয় লেখকেরা পক্ষপাতিত্বমূলক বর্ণনাগুলো যেরূপ নিপুণ তুলিতে এঁকে দিতে পারেন, এশীয়রা তা পারেন না।

শা'জাহানকে বন্দী করা

শাজাহানকে বন্দী করার ব্যাপারে তাঁর বিরুদ্ধে দোষারোপ এমনই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, এর জন্য একটা পৃথক ও বিশেষ অধ্যায় রচনা করা উচিত ছিল। কিন্তু এই প্রশ্নটা দারাশেকোর ঘটনাবলীর সঙ্গে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, একটা অপরটা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না।

দারাশেকো শাজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও সর্বাপেক্ষা প্রিয় পুত্র ছিলেন। (ধারাবাহিকভাবে এ সমস্ত ঘটনা খাফী খাঁ থেকে গৃহীত)। হিজরীর ১০৬৭

সালের ৭ই জিলহজ্জ তারিখে শা'জাহান বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হয়ে রাজকার্য পরিচালনায় অপারগ হয়ে পড়লেন। সুযোগ বুঝে দারাশেকো রাজ্যের বল্গা স্বহস্তে ধারণ করলেন। এরপর প্রথমেই তিনি মির্জা মুরাদ, শুজা ও আলমগীরের দূতদের নিকট থেকে, যাঁরা দরবারে অবস্থান করতেন, মুচলেকা গ্রহণ করলেন যেন তাঁরা দরবারের কোন খবর বাইরে পাঠাতে না পারেন। সঙ্গে সঙ্গে বাংলা, গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যের পথগুলোও বন্ধ করে দিলেন, যেন পথিকেরা ঐ সকল পথে চলাফেলা না করে। উদ্দেশ্য ছিল, মুরাদ, শুজা ও আলমগীর—যাঁরা ঐ সকল সুবার শাসনকর্তা ছিলেন, তাঁরা যেন রাজধানীর কোন সংবাদ অবগত হতে না পারেন। কিন্তু এটা এমন ব্যাপার ছিল না যে, গোপন করলেই তা গুপ্ত হতে পারে। বরং সমগ্র দেশে রটে গেল এবং সর্বত্র বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল। সর্বপ্রথম শুজা, যিনি দারাশেকোর অনুজ এবং আলমগীরের অগ্রজ ছিলেন তিনি বাংলাদেশে আপনাকে বাদশাহ বলে ঘোষণা করলেন। অনুরূপভাবে গুজরাটের আহমেদাবাদে মুরাদ নিজ নামে আনুষ্ঠানিকভাবে মুদ্রা ও খুৎবা প্রচলন করলেন। কিন্তু আলমগীর এক্ষেত্রে কোনরূপ স্বেচ্ছাচারিতা প্রদর্শন করেননি। এ সময়ে তিনি শাজাহানের আদেশে গুলবার্গার অবরোধ-কার্যে লিপ্ত ছিলেন। জয় হয় হয়, এমন সময় হঠাৎ দারাশেকো শাজাহানের নাম করে ঐ সমস্ত রাজকর্মচারীদের রাজধানীতে ফিরে আসতে নির্দেশ দিলেন, যাঁরা আলমগীরের সৈন্যদলভুক্ত হয়ে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। অনন্যোপায় হয়ে আলমগীর বিজাপুরাধিপতির নিকট থেকে এক কোটি টাকা নজরানা নিয়ে সন্ধি স্থাপন করলেন। ফলে এই অভিযান অসমাপ্ত রয়ে গেল। দারা এই করেই শেষ করেননি, বরং ঈসা বেগকে যিনি রাজধানীতে আলমগীরের দূত ছিলেন, তাঁকে বন্দী করে তাঁর গৃহ বাজেয়াপ্ত করে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই যোধপুরাধিপতি মহারাজা যশোবন্ত সিংকে সৈন্য ও তোপখানাসহ গুজরাট অভিমুখে পাঠিয়ে দিলেন এবং তাঁকে বলে দিলেন যে, আলমগীর ওখান থেকে অগ্রসর হইলে যেন তাঁকে বাধাদান করা হয়।

আলমগীর ১০৬৮ হিজরীর ১২ই জমাদিউল আউয়াল তারিখে অর্থাৎ শা'জাহানের পীড়িত হবার ৫ম মাসে বিজাপুর থেকে অগ্রসর হয়ে ২৫শে জমাদিউল আউয়াল তারিখে বুরহানপুর এলেন। এখানে একমাস কাল অবস্থান

করে রাজধানীর খবর সংগ্রহ করতে থাকলেন। ইতিপূর্বে মির্জা মুরাদের সঙ্গে এই মর্মে একটা চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল যে, এক নির্দিষ্ট স্থানে তাঁরা উভয়ে মিলিত হবেন। এই চুক্তি মোতাবেক ভ্রাতৃদ্বয় নর্মদা নদী পার হয়ে দিয়ালপুরে একত্রিত হন। এই সংবাদ শোনা মাত্র মহারাজা যশোবন্ত সিং সৈন্যসহ অগ্রসর হলেন এবং আলমগীরের শিবির থেকে মাত্র দেড় মাইল দূরে স্বীয় শিবির স্থাপন করলেন। আলমগীর ভাকার বিখ্যাত কবি কবকালাহ্ ব্রাহ্মণকে রাজার নিকট এই প্রস্তাব দিয়ে প্রেরণ করলেন যে, তাঁরা শুধু শয্যাগত পিতার দর্শনলাভের জন্যই যাত্রা করেছেন। সুতরাং তিনি যেন তাতে অন্তরায় না হন। কিন্তু রাজা এতে কর্ণপাত করলেন না। গুরুতর যুদ্ধ সংঘটিত হল। রাজা পরাজিত হয়ে গৃহাভিমুখে পলায়ন করলেন। পলায়নপর রাজা গৃহে প্রত্যাবর্তন করলে তাঁর স্ত্রী তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলেন। সারা জীবন তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে আর কখনও শয্যা গ্রহণ করেননি। তিনি বলেছিলেন, পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারী ব্যক্তি কখনও তাঁর সঙ্গে শয্যাগ্রহণের উপযুক্ত হতে পারে না। অভিনব এই ঘটনা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকার যোগ্য। (খাফী খাঁ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪২)।

শা'জাহান আগ্রা থেকে দিল্লী যাবার পথে যশোবন্ত সিংহের পরাজয়ের খবর জানতে পারলেন। আগ্রার আবহাওয়া শাজাহানের পক্ষে যতই অবাঞ্ছিত হোক না কেন এবং সেজন্য আগ্রায় ফিরে আসাও যতই অনভিপ্রেত হোক না কেন, তিনি তো তখন নামে মাত্র জীবিত ছিলেন। দারাশেকো আবার তাঁকে আগ্রায় ফিরিয়ে নিলেন এবং স্বয়ং ৬০,০০০ (ষাট হাজার) অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে আলমগীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন। শাজাহান বার বার তাঁকে বারণ করলেন এবং বুঝালেন যে, তাঁর পক্ষে এ যুদ্ধযাত্রা শুভ নয়, তিনি স্বয়ং গিয়ে এ বিবাদের মীমাংসা করবেন, তদনুসারে সম্মুখ-শিবির বাইরে স্থাপন করতে তিনি আদেশও দিলেন। কিন্তু দারাশেকো তাতে সম্মত হলেন না। বরং তিনি আগ্রা থেকে রওয়ানা হয়ে হিজরীর ১০৬৮ সালে ১৬ই শাবান তারিখে সমুগড় নামক স্থানে শিবির স্থাপন করলেন। এইখানেই আলমগীর ও মির্জা মুরাদ সৈন্য-সামন্তসহ অবস্থান করছিলেন। তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হ'ল। আলমগীর জয়লাভ করলেন। মির্জা মুরাদ রণক্ষেত্রে করুণ

দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছিলেন, যদিও তাঁর হাতীর হাওদা তীরের দ্বারা ছেয়ে গিয়েছিল এবং নিজেও রক্তের ধারায় প্লাবিত হয়ে গিয়েছিলেন, তথাপি পাহাড়ের ন্যায় অটল থেকে তীরবর্ষণ করছিলেন। এই হাওদাটা ফররুখ শিয়রের আমল পর্যন্ত স্মৃতিস্বরূপ দুর্গের ভিতরে রক্ষিত ছিল। যখনই কেউ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করত, আলমগীরের কন্যা বাদশা বেগম তাকে ঐ হাওদা প্রদর্শন করতেন এবং বলতেন যে, এই হ'ল তৈমুরী বংশের বীরত্বের নমুনা।

পরাজিত দারাশেকো আগ্রায় পৌঁছে দম ফেললেন। লজ্জায় শাজাহানকে আর মুখ দেখাতে পারলেন না। শা'জাহান তাঁকে যুক্তি ও পরামর্শের জন্য বার বার ডেকে পাঠালেন। কিন্তু তিনি ঐ রাত্রেই সপরিবার লাহোরের উদ্দেশ্যে দিল্লী রওয়ানা হলেন। (খাফী খাঁ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩০)।

পক্ষান্তরে, আলমগীর ১০৬৮ হিজরী সালে ১৭ই রমজান তারিখে শাহজাদা মোহাম্মদ সুলতানকে শাহী দুর্গ অধিকার করে নেবার জন্য আগ্রা প্রেরণ করলেন এবং শাজাহানের খেদমতে এই নিবেদন জ্ঞাপন করতে বললেন যে, তিনি যেন আর দুর্গের বাইরে আসবার চেষ্টা না করেন। এই হ'ল সর্বশেষ ঘটনা, যা আলমগীরের উজ্জ্বল নৈতিক চরিত্রের সর্বাপেক্ষা কুৎসিৎ চিত্র।

গোটা ইতিহাসের এই হল মোটামুটি সারাংশ। এর আদ্যোপান্ত সমস্তই খাফী খাঁর গ্রন্থ থেকে গৃহীত। মূল আলোচনাটার উপসংহার রচনা করবার পূর্বে কিছুক্ষণের জন্য শাজাহান থেকে বিদায় নিয়ে দারাশেকোর প্রতি মনোনিবেশ করছি। অতীত ঘটনাবলীর মধ্যে দারাশেকোর কার্যাবলী নিম্নরূপ ঃ

(১) শা'জাহান পীড়িত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মির্জা মুরাদ, আলমগীর এবং শুজার প্রতিনিধি, যাঁরা শাজাহানের দরবারে অবস্থান করতেন, তাঁদের নিকট থেকে দারাশেকো এই মুচলেকা গ্রহণ করলেন, যেন তাঁরা শাজাহান এবং তাঁর দরবারের কোন সংবাদ কাউকেই লিখে জানাতে চেষ্টা না করেন।

(২) বাংলা, গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যের রাস্তাগুলো বন্ধ করে দিলেন যেন পথচারীদের মারফত কারও নিকট খবর না পৌঁছে।

(৩) আলমগীরের প্রতিনিধির গৃহ বাজেয়াপ্ত করে তাঁকে বন্দী করলেন।

(৪) আলমগীর যখন বিজাপুরের অবরোধ নিয়ে ব্যস্ত, সে-সময়ও তার সঙ্গী সমস্ত রাজকর্মচারীদেরকে তিনি রাজধানীতে ফিরিয়ে আনলেন।

(৫) কোন শাহজাদার পক্ষ থেকে বিদ্রোহ ঘোষণা ব্যতিরেকেই দারাশেকো স্বয়ং মুরাদ, আলমগীর ও শুজার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করলেন।

এই ছিল প্রকৃত ঘটনাবলী যাতে কোন ঐতিহাসিকের দ্বিমত নেই। কিন্তু আমি আরও নিশ্চিত হবার জন্য কতিপয় জরুরী ঘটনা সম্পর্কে অত্যন্ত বিশ্বস্ত প্রমাণাদি উদ্ধৃত করছি।

(ক) ঠিক গুলবার্গার অবরোধ মুহূর্তে আলমগীরের কর্মচারিগণ ও সৈন্য-সামন্তদের প্রতি প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ

"ইতিমধ্যে দুইদফা আদেশ যা দারাশেকোর অভিপ্রায় মত যথাক্রমে মহাবত খাঁ ও রাবেস্তারছালের নামে লেখা হয়েছিল, তা স্বয়ং সম্রাটের দরবার থেকেই প্রেরণ করা হয়েছিল। তাতে নির্দেশ ছিল, মহাবত খাঁ ও রাবেস্তারছাল যেন সমস্ত রাজপুতদেরসহ আলমগীরের বিনানুমতিতেই ভীত ও সন্ত্রস্ত না হয়ে চলে আসেন। এই কারণে আলমগীরের সৈন্যদলের মধ্যে দুর্বলতা ও উদাসীনতা দেখা দিল। ফলে সৈন্যদল ধৈর্য ও দৃঢ়তা হারিয়ে এবং সৈন্য সাহায্যের সম্ভাবনায় নিরাশ হয়ে বিচলিত হয়ে পড়ল।" ('ওয়াকেয়াতে আলমগীরি', আকেল খাঁ কৃত)।

এতদসত্ত্বেও আলমগীর কোনরূপ বিদ্রোহ প্রদর্শন করেননি। বরং যখন মুরাদ ও শুজা আপন আপন সুবায় নিজেদের বাদশাহ বলে ঘোষণা করলেন, তখন পর্যন্ত আলমগীর কোন কার্যসূচী গ্রহণ করেননি। অধিকন্তু তিনি মুরাদকে পত্র লিখেছিলেন যে, এখনও হুজুর কেবলা জীবিত আছেন; সুতরাং আমাদের পক্ষে নিজ নিজ স্থান ত্যাগ করা সমীচীন নয়। সুরাটে তুমি যে সৈন্য প্রেরণ করেছ তাও উচিত ছিল না। আলমগীর মুরাদকে যে পত্রখানা লিখেছিলেন তাতে লেখা ছিল :

"যা কিছু লেখা হয়েছে তা এই যে, এখন পর্যন্ত অনিবার্য অঘটনটি সংঘটিত হওয়ার কোন খবর (শাজাহানের মৃত্যু সংবাদ) আমাদের কাছে পৌঁছেনি। বরং তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতির লক্ষণই প্রকাশ পাচ্ছে। এমতাবস্থায় আমাদের পক্ষে স্থান ত্যাগ করা অথবা পদমর্যাদার আকাঙ্ক্ষায় অগ্রসর হওয়া শোভনীয় নয়। ভ্রাতৃবর যদি যথারীতি অনুসন্ধান নেবার পর সুরাটে সৈন্য প্রেরণ করতেন এবং এই ব্যাপারে তাড়াহুড়া না করতেন, তবেই ভাল হত ... ...।" ('ফাইয়াজুল কাওয়ানিন' অর্থাৎ 'মাকাতিবে তৈমুরিয়া' ইত্যাদি)।

(খ) আলমগীর ও মুরাদের প্রতিনিধিদেরকে নজরবন্দী করা এবং সংবাদ প্রেরণ রহিত করা

"আমার ও ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতিনিধিরা বাস্তবিকপক্ষে নজরবন্দী হয়ে আছেন। কেননা, মুলহেদ অর্থাৎ দারাশেকো একদল লোক নিযুক্ত করে রেখেছেন যে, ঐ সকল প্রতিনিধিরা দেশে বা বিদেশে যেখানেই থাকুক না কেন, তারা ঐ প্রতিনিধিদের গৃহে পাহারারত থাকবে। আরও নির্দেশ দিয়েছেন যে, ঐ স্থানের সংবাদাদি মীর সালেহ এর কথিত মত তাঁকে লিখবে। (ফাইয়াজুল কাওয়ানিন)।

(গ) আলমগীরের প্রতিনিধির গৃহ বাজেয়াফতকরণ

"সরকারের (আলমগীরের) প্রতিনিধি দসা বেগকে বিনাদোষে বন্দী ও তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াফত করার জন্য ফরমান জারি করা হলো।" ('মাসেরে আলমগীরি', কলিকাতার ছাপা, পৃঃ ৪)।

উল্লিখিত ঘটনাবলী প্রমাণিত হবার পর এখন জিজ্ঞাস্য হ'ল প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দারাশেকো ও আলমগীরের কার্যকলাপ পর্যালোচনা করলে কাকে দোষী সাব্যস্ত করা যায়? সংবাদ প্রেরণ বন্ধ করা, আলমগীরের প্রতিনিধিদের নজরবন্দী করা, তাঁর জায়গীর বাজেয়াফত করা (সুবায়ে বেরার আলমগীরের জায়গীরের মধ্যে ছিল, দারাশেকো তা বাজেয়াফত করে নিয়েছিলেন। মুরাদ বখশের পত্রাদিতে বার বার এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

ফাইয়াজুল কাওয়ানিন, ১ম খণ্ড পৃঃ ৬৫)। ঠিক যুদ্ধের মুহূর্তে আলমগীরের প্রতিনিধি ও সৈন্যদের তাঁর নিকট থেকে অর্থাৎ যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরিয়ে আনা, মহারাজা যশোবন্ত সিংকে আলমগীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদেশ প্রদান করা ইত্যাদি কি ধরনের কার্যকলাপ? এর কোন একটা কাজকেও 'যুক্তিসঙ্গত' বলে কারণ দর্শান যেতে পারে কি? আপনারা বলতে পারেন, এ সমস্তই দারাশেকোর কীর্তি। অতএব এ সকল কাহিনী শা'জাহানের আলোচনার মধ্যে টেনে নিয়ে আসা একান্তই ভ্রান্তনীতির পরিচায়ক। কিন্তু আলমগীরের সমুদয় কার্যকলাপ, যা তিনি এযাবৎ করে এসেছেন অর্থাৎ দাক্ষিণাত্য থেকে তাঁর রওয়ানা হওয়া, দারাশেকোর পক্ষ থেকে যশোবন্ত সিং বাধা প্রদান করায় তাকে সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত করা এবং অবশেষে তাঁর আগ্রায় পৌঁছে যাওয়া—এ সমস্তই দারাশেকোর বিরুদ্ধে ছিল। তবু শাজাহান সংক্রান্ত আলোচনায় এ সকল ঘটনাবলীর অবতারণা করতে যাওয়ার একমাত্র কারণ হচ্ছে এই যে, সরলমনা ঐতিহাসিকেরা এ সকল অঘটন শাজাহানের বিরুদ্ধেই ঘটানো হয়েছে মনে করে আলমগীরের আচরণকে অন্যায় বলে গণনা করে থাকেন।

এতে সন্দেহ নেই যে, ঐ সময়ে অসহায় শাজাহান আপাদমস্তক দারাশেকোর কবলিত হয়ে পড়েছিলেন। দারাশেকো যা কিছু করতে চাইতেন শাজাহানের নামেই করে যেতেন। খাফী খানের বর্ণনা আপনারা উপরে পড়ে এসেছেন যে, শাজাহানের আগ্রার ফিরে যাবার আদৌ ইচ্ছা ছিল না, দারাশেকো তাঁকে বাধ্য করেছিলেন; দারাশেকো যখন যুদ্ধযাত্রা করলেন, শাজাহান তাঁকে বার বার বাধা প্রদান করছিলেন, কিন্তু তিনি তাতে কর্ণপাত করলেন না; শাজাহান আলমগীর সংক্রান্ত বিরোধের মীমাংসার জন্য স্বয়ং যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু দারাশেকো যেতে দেননি।

ডাঃ বার্নিয়ার তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্তের ভিতরে এ সম্পর্কে লিখছেন ঃ "এ সময় শাজাহানের অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। বিপদ-আপদ ও অসুখ-বিসুখের জটিলতা ছাড়াও আসলেই তিনি দারাশেকোর স্বেচ্ছাচারিতার কবলে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন।" (ভ্রমণ-বৃত্তান্তের অনুবাদ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৫)।

মুরাদ এক পত্রে আলমগীরকে লিখছেন ঃ

"যাহোক, মোটামুটি ব্যাপার এই যে, ধৈর্য ও প্রতিপত্তিহীন দারাশেকো হুজুরে আক্‌দাস শাজাহানের সমস্ত রাজকীয় ক্ষমতা স্বীয় করায়ত্ত করে ফেলেছেন।"

এর চেয়েও গুরুতর বিষয় এই যে, দারাশেকো শাজাহানের হস্তলিপির অবিকল অনুলিপি প্রস্তুত করবার দক্ষতা অর্জন করেছিলেন এবং ফরমানাদিতেও শাজাহানের দস্তখত স্বয়ং স্বহস্তে প্রদান করতেন।

আর এক পত্রে মুরাদ আলমগীরকে লিখছেন ঃ

"মুলহেদ দারাশেকো হজরতে আক্‌দাস শাজাহানের হস্তলিপি সুনিপুণভাবে নকল করবার দক্ষতা অর্জন করে ফরমানসমূহের উপর স্বয়ং দস্তখত করে থাকেন।" (মুরাদের পত্রাবলীর ভাষা—মাকাতিবে তৈমুরিয়া, যার নাম 'ফাইয়াজুল কাওয়ানিন' থেকে উদ্ধৃত হয়েছে)।

এ সকল ক্ষেত্রে মুরাদের বর্ণনা অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য এই কারণে যে, তিনি দৈনন্দিন ঘটনাবলী আলমগীরকে লিখে জানাচ্ছিলেন। সুতরাং এরূপ সন্দেহ করবার কোনই কারণ নেই যে, তিনি লোককে ধোকা দেয়ার জন্য লিখছেন। মুরাদ এবং আলমগীরের সম্পর্ক তখন পর্যন্ত অন্তরঙ্গ ও সৌহার্দপূর্ণ ছিল।

উল্লিখিত ঘটনাপুঞ্জীর ভিত্তিতে আলমগীরের পক্ষে শুধু ঐ সকল আদেশ মান্য করারই প্রয়োজন ছিল, যেগুলো সত্যিকারের শাজাহানের আদেশ ছিল। এও সুস্পষ্ট যে, যশোবন্ত সিংকে আলমগীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রেরণ করা দারাশেকোরই ষড়যন্ত্র ছিল, শাজাহান এতে রাজী ছিলেন না।

দারাশেকোর বিরুদ্ধে আলমগীরের যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া স্বীয় ক্ষমতা রক্ষার জন্য অবশ্যকরণীয় বিষয় হয়ে পড়েছিল। ডাঃ বার্নিয়ার যদিও আলমগীরের শ্রেষ্ঠতম বিরোধী ব্যক্তি ছিলেন, তথাপি তিনি আলমগীর-ভ্রাতৃবৃন্দের যুদ্ধলিপ্সার বিষয় লিখছেন ঃ

"সত্যিই এদের পক্ষে স্বীয় অভিলাষ (সিংহাসনের আশা) থেকে বিরত থাকা দুষ্কর ছিল। কেননা জয়লাভ করতে পারলে অবশ্য সিংহাসন লাভের আশা ছিল। কিন্তু পরাজিত হলে জীবন হারাবার আশঙ্কা ছিল

সুনিশ্চিত। সুতরাং দুটিই মাত্র পথ ছিল—হয় মৃত্যু, না হয় সিংহাসন। যেমন নাকি শা'জাহান নিজেও আপন ভ্রাতৃবৃন্দের রক্তে হস্ত রঞ্জিত করে সিংহাসনারোহণ করেছিলেন, তেমনিভাবে তাঁদেরও (আলমগীর-ভ্রাতৃবৃন্দের) সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাঁরাও যদি অকৃতকার্য হয়ে পড়েন, তাহলে তাঁদেরও বিজয়ী ব্যক্তির হস্তে নিহত হওয়া অবধারিত।" (বার্নিয়ারের ভ্রমণ-বৃত্তান্তের অনুবাদ, পৃঃ ৪৬ ও ৪৮)।

লেনপুল সাহেব লিখছেন :

"আওরঙ্গজেব নিশ্চয়ই জানতেন, ভ্রাতৃবৃন্দের মধ্যে যে-কোন ব্যক্তির সিংহাসন লাভের ফলস্বরূপ হয়ত তাঁকে বন্দী হতে হবে, না হয় নিহত হতে হবে। সুতরাং তিনিও মনে মনে সঙ্কল্প গ্রহণ করে থাকবেন যে, রাজত্ব লাভের জন্য একটা নীলামী বুলি আওড়াবেন। কারণ, জীবন রক্ষার জন্য তাঁর রাজত্ব লাভ করার একান্তই প্রয়োজন ছিল। (লেনপুল কৃত 'আওরঙ্গজেব' এর অনুবাদ, পৃঃ ২১)।

যাহোক আলমগীর, যশোবন্ত সিং ও দারাশেকোর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন ও পরাস্ত করেছিলেন এবং একটা লিখিত কৈফিয়ত দ্বারা তিনি শাজাহানকে আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনাবলী জ্ঞাপনও করেছিলেন। তদুত্তরে শাজাহান স্বহস্তে একটা সান্ত্বনাবাণী লিখে পাঠালেন এবং পুরস্কারস্বরূপ একখানা তরবারি প্রেরণ করলেন যাতে 'আলমগীর' শব্দটা খোদিত ছিল। খাফী খাঁ বিস্তারিতভাবে এর ইতিহাস লিখে গিয়েছেন।

আলমগীরের সমালোচনাকারী এক্ষেত্রে কৈফিয়তস্বরূপ বলতে পারেন যে, তিনি যা কিছুই করে থাকেন তা তাঁর ক্ষমতা রক্ষার জন্যই করেছেন; কিন্তু যখন তিনি যশোবন্ত সিংকে পরাস্ত করে আগ্রার নিকটবর্তী হলেন তখন শাজাহান তাঁকে বারবার ডেকে পাঠালেন, উপঢৌকন ও পারিতোষিকাদি প্রেরণ করলেন, স্নেহাশীষপূর্ণ পত্র লিখলেন এবং সর্বোপরি, সাম্রাজ্য এমন-ভাবে বণ্টন করে দিতে চাইলেন, যার চেয়ে উত্তম ব্যবস্থা আলমগীরের পক্ষে চিন্তা করবার আর কিছুই ছিল না; অর্থাৎ দারাশেকোর জন্য পাঞ্জাব ও কাবুল, মুরাদের জন্য গুজরাট, শুজার জন্য বাংলা এবং আলমগীরের জন্য যুবরাজের মনসব ও রাজধানীর রাজত্ব দান। তথাপি পিতার নাফরমানী

করা, অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করা, এবং পরিশেষে বৃদ্ধ পিতাকে দুর্গমধ্যে বন্দী করে রাখা চরিত্রধর্মে কুফরী অপেক্ষাও নিকৃষ্টতর নয় কি?

কিন্তু বিশেষভাবে চিন্তা করে দেখবার বিষয় এই যে, সত্যিই কি শাজাহান তাই করতেন যা তিনি বলেছিলেন? সন্ধান নিয়ে দেখা যাক।

ইসলামী ব্যবস্থা মতে শাজাহান ও আলমগীর উভয়েই সমানভাবে শ্রদ্ধার পাত্র। যদিও তাঁরা খলীফা নন তবু আভিধানিক অর্থে (শরায়ী অর্থে নহে) আমীরুল মুমেনিন তো বটেই। এঁদের কাউকেই দোষী সাব্যস্ত করতে প্রাণ কেঁপে উঠে। কিন্তু সততা ও ঐতিহাসিকতার কর্তব্য কি? শাজাহান ও আলমগীর উভয়েই সম্মানের পাত্র হলেও তাঁদের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর আর একটা বস্তু আছে। তা হচ্ছে ন্যায়নিষ্ঠতা ও সত্যবাদিতা। এই সর্বোচ্চ বস্তুটার নিকটেই আমার শির নত করা উচিত।

সমস্ত ঐতিহাসিকদের মধ্যে একমাত্র আকেল খাঁই এই বিষয়টার উপরে বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করেছেন। আলমগীরের নামে শাজাহানের বেদনাদায়ক পত্রাবলী যা পাঠ করলে পাষাণও বিগলিত হয়ে যায়, তা অবিকল নকল করেছেন। স্বয়ং জাহানারা বেগম শাজাহানের নির্দেশে আলমগীরকে যে পত্র দিয়েছিলেন তাও নকল করেছেন। আলমগীরকে যারা শাজাহানের খেদমতে উপস্থিত হতে বাধা দিয়েছিল তাদেরকে কলহপ্রিয় ও ঝগড়া সৃষ্টিকারী বলে আখ্যায়িত করেছেন। শুধু তাই নয়, গোটা কাহিনীটা এত বিস্তারিত, উদ্দীপনাময় ও বেদনাদায়ক ভাষায় লিখেছেন যে, পাঠকদের অন্তরে আপনা-আপনিই আলমগীরের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হয়। কিন্তু ঘটনা-বৈচিত্র্যে অবস্থা যখন পরিশেষে এই দাঁড়ায় যে, আলমগীর শ্রদ্ধেয় পিতার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় স্বীয় শিবির থেকে বহির্গত হয়ে পড়েছেন এবং তাঁর বন্ধু-বান্ধব তাঁকে বাধা প্রদান করছেন তখন হঠাৎ পরিস্থিতি বিরূপ ঘোরালো হয়ে দাঁড়ালো তা এই আকেল খাঁর ভাষাতেই শুনুন:

"ঠিক সেই মুহূর্তে যখন আলমগীর তাঁর রাষ্ট্রীয় বন্ধু-বান্ধবদের পরামর্শ শুনে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন তখন অকস্মাৎ নাহারদেল খাঁ চিলা সেখানে পৌঁছে গেলেন। শাজাহান স্বহস্তে দারাশেকোর নামে একখানা পত্র লিখে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তাঁর নিকট অর্পণ করেছিলেন এবং সতর্ক

করে দিয়েছিলেন যেন এই পত্র সম্বন্ধে ঘুণাক্ষরেও কেউ কিছু অবগত হতে না পারে। সে যেন ছুটে গিয়ে দারাশেকোর নিকট থেকে এই পত্রের জওয়াব নিয়ে আসে। পত্রের মর্ম এই ছিল যে, 'তুমি দারাশেকো নিশ্চিন্ত মনে শাজাহানাবাদে অর্থাৎ দিল্লীতেই অবস্থান কর, সেখান থেকে অগ্রসর হয়ো না। আমি এখানে বসেই ব্যাপারটার সমাধি রচনা করে দেব'।"

পত্রের মর্ম আলমগীরের হিতৈষীদের ধারণার সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে গেল।

'মাসেরুল উমারা'তেও এই ঘটনা নিতান্ত বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে। শেষের কয়েকটি পংক্তি এইরূপ :

"ঠিক সেই মুহূর্তে যখন আলমগীর তাঁর পারিষদবর্গের পরামর্শ শুনে ইতস্ততঃ চিন্তা করছিলেন কি করা যায়, তখন হঠাৎ নাহারদিল খাঁ চিলা একটা আদেশনামা নিয়ে এসে উপস্থিত হ'ল। শাজাহান স্বহস্তে দারাশেকোর নামে আদেশনামাখানা লিখে পাঠিয়েছিলেন এবং অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে তাঁর (নাহারদিল খাঁর) হস্তে ন্যস্ত করেছিলেন। নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন দ্রুত শাজাহানাবাদে পৌঁছে দারাশেকোর নিকট থেকে জওয়াব নিয়ে আসে। আদেশনামার মর্ম এই ছিল যে, দারাশেকো যেন সৈন্য-সামন্ত যোগাড় করে দিল্লীতেই স্থির হয়ে বসে থাকে। তিনি অর্থাৎ শাজাহান সেখান থেকেই ব্যাপারটা শেষ করে ফেলবেন।" (মাসেরুল উমারা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৯৭)।

একজন অন্য ধর্মাবলম্বী লোক, যিনি আলমগীরের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন, কিন্তু এই সকল কলহের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন, তাঁর বর্ণনায় বিষয়টার জটিলতা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। তিনি লিখছেন :

"শাজাহান একজন বিশ্বস্ত নপুংস অনুচরের মারফত আওরঙ্গজেবের নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করলেন যে, 'নিশ্চয়ই দারাশেকো যা কিছু করেছে সমস্তই অসঙ্গত ছিল'। তিনি তার মূর্খতাব্যঞ্জক ও অযৌক্তিক কার্যাবলীর উল্লেখ করে লিখলেন যে, 'কিন্তু আমি তো প্রথম থেকেই তোমার প্রতি আন্তরিক স্নেহ ও মমতা পোষণ করে আসছি। অতএব অবিলম্বে আমার নিকট তোমার চলে আসা উচিত এবং আমার সঙ্গে বুঝাপড়া

করে ঐ সমস্ত বিষয়গুলোর সুরাহা করে ফেলা উচিত যা অত্যন্ত এলোমেলো পরিস্থিতির কারণে উপেক্ষিত হয়ে পড়ে আছে'। কিন্তু এই হুঁশিয়ার শাহজাদা সন্দেহবশতঃ বাদশার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করতে সাহসী হননি। কারণ, তিনি জানতেন যে, বেগম সাহেব (জাহানারা বেগম) মুহূর্তের জন্যেও বাদশার সঙ্গ ত্যাগ করেন না এবং তিনি বাদশার মন-মেজাজের উপর এমন প্রভাবশীলা যে তিনি যা করতে ইচ্ছা করেন বাদশাহ তাই করেন। সুতরাং এই ডেকে পাঠানো একটা ভাঁওতা মাত্র। জাহানারা বেগম 'কুল মাকিনিউ' অর্থাৎ তাতারী স্ত্রীলোকদের মধ্য থেকে, যারা অন্দরমহলে প্রহরার কার্যে নিযুক্ত ছিল, সেধরনের কতকগুলো বিরাটকায়, শক্তিশালী ও অস্ত্রধারী স্ত্রীলোককে এই উদ্দেশ্যে প্রস্তুত রেখেছিলেন যে, যখনই তিনি (আলমগীর) দুর্গে প্রবেশ করবেন সঙ্গে সঙ্গে তারা যেন ওঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।" (ডাঃ বার্নিয়ারের ভ্রমণ-বৃত্তান্তের উরদু অনুবাদ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৪)।

লেনপুল সাহেব সত্যই লিখেছেন,

"যে জাল শাজাহান তাঁর পুত্রকে ফাঁসাবার জন্য বিস্তার করেছিলেন তিনি স্বয়ং সে জালে ফেঁসে গেলেন।" (লেনপুলের অনুবাদ, পৃঃ ৪৫)।

আলমগীর শাজাহানের খেদমতে উপনীত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করবার জন্য বহুবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শাজাহান এখনও দারার স্বপ্নই দেখছিলেন। এর কারণ এই যে, সে-সময় শাজাহানের সর্বাধিক প্রিয়পাত্রী জাহানারা বেগম দারাশেকোর পক্ষপাতী ছিলেন। শাজাহান হিন্দী ভাষায় শুজাকেও গোপনে আলমগীরের বিরুদ্ধে এক পত্র লিখেছিলেন এবং তাঁর এই ধরনের প্রচেষ্টা বরাবরই চালু ছিল। সুতরাং আলমগীর হতাশ হয়ে বসে পড়লেন। খাফী খাঁ লিখছেন :

"আলমগীর তাঁর শ্রদ্ধাস্পদ পিতার খেদমতে উপনীত হয়ে স্বীয় অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিসমূহ—যা তকদীরে লেখা ছিল এবং অমত্য ভাই-এর কারণে সংঘটিত হয়েছিল, সে-ব্যাপারে ক্ষমা প্রার্থনা করবার জন্য বারংবার ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু অবশেষে যখন বুঝতে পারলেন যে, আ'লা হজরত পিতা দারাশেকোর প্রতিই আকৃষ্ট হয়ে পড়েছেন এবং সম্পর্কের

সমস্ত বিবেচনাই অদৃষ্টের পরিহাসে বানচাল হয়ে গিয়েছে, তখন স্বনামধন্য পিতার সাক্ষাৎ লাভের উদগ্র বাসনা বর্জন করাই সমীচীন বোধ করলেন।" (১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪)।

এই সময় শাজাহান কাবুলে অবস্থিত সেনাপতি মহাবত খাঁকে একখানা পত্র লিখেছিলেন। ঐ পত্রখানা খাফী খাঁ পুরোপুরি নকল করেছেন। উহার কতিপয় ছত্র ছিল এইরূপ :

"যখন নিপীড়িত পুত্র দারাশেকো পরাজিত হয়ে লাহোর গমন করলেন তখন তাঁকে সাহায্য ও সহানুভূতি প্রদর্শন হেতু তিনি তাঁর দুই নালায়েক পুত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ও প্রতিশোধ গ্রহণ করতে প্রবৃত্ত হন।"

শাজাহানের ইত্যাকার ষড়যন্ত্র ও শত্রুতামূলক কার্যকলাপের পরেও আলমগীর এরূপ সৌজন্য প্রদর্শন করলেন যে, শাহজাদা আজমকে তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করবার জন্য শাজাহানের খেদমতে প্রেরণ করলেন এবং ৫০০ আশরফী ও ৪ হাজার টাকা নজরানাস্বরূপ প্রেরণ করলেন। কিছুদিন পর দুর্গ সম্পর্কে যখন তিনি নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিলেন তখন শাজাহানের সর্বপ্রকারের আরামের ব্যবস্থা করে দিলেন। ডাঃ বার্নিয়ারকে তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও এর সাক্ষ্যদান করতে হয়েছে :

"যাহোক শাজাহানের সহিত আওরঙ্গজেবের ব্যবহার সহানুভূতি ও শ্রদ্ধাবিবর্জিত ছিল না। তিনি যথাসাধ্য বৃদ্ধ পিতার যত্ন নিতেন এবং প্রচুর উপঢৌকনাদি প্রেরণ করতেন। জরুরী রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে পীর ও মুরশেদের উপদেশের ন্যায় তিনি স্বীয় পিতার মতামত ও উপদেশ গ্রহণ করতেন। তাঁর পত্রাদিতেও যা তিনি প্রায়শই নিবেদন করতেন তাতে শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রকাশ পেত। এই উপায়েই শাজাহানের অনমনীয় মনোভাব ও ক্রোধ শেষ পর্যন্ত এমন ঠাণ্ডা হয়ে এল যে, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে পুত্রকে উপদেশাবলী প্রেরণ করতে লাগলেন। বরং বিদ্রোহী পুত্রের সকল প্রকার বেয়াদবী ক্ষমা করে তাকে আশীর্বাদ জানালেন।" (ডাঃ বার্নিয়ারের ভ্রমণ-বৃত্তান্তের অনুবাদ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮৯)।

এখন বিচার করে দেখুন, জাহাঙ্গীর শাজাহানের জায়গীর নুরজাহানকে দিয়ে দিয়েছিলেন। শুধু এইটুকু কারণে শাজাহান বছরের পর বছর ধরে

জাহাঙ্গীরের সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেছিলেন। অথচ অন্যান্য সকল সুবিধাই পূর্ববৎ ছিল। তবু শাজাহান নিষ্কলঙ্ক। পক্ষান্তরে, আলমগীরের জায়গীর কেড়ে নেয়া হল, বেতন বন্ধ করে দেয়া হল, শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত অবস্থায় তাঁরই সৈন্যদেরকে তাঁর নিকট থেকে ফিরিয়ে আনা হল, ৭৫ হাজার সৈন্য তাঁরই বিরুদ্ধে এবং তাঁকেই হত্যা করবার জন্য প্রেরণ করা হল, দুর্গমধ্যে ডেকে নিয়ে তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করা হ'ল; তা সত্ত্বেও তিনি শাজাহানকে যথারীতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করেছিলেন। তবু তিনি কলঙ্কিত।

"মাতাল ও সুফী নেশাগ্রস্ত সবাই প্রস্থান করে চলে গিয়েছে,
আমার কাহিনী গলি ও বাজারেই পড়ে রইল।"

ইতিহাস লেখকদের ভাগ্যে তাঁদের বিচারের গণ্ডীর মধ্যে এরূপ সুযোগ খুব কমই ঘটে থাকে যে, স্বয়ং অপরাধীর স্বহস্ত-লিখিত বর্ণনা তাঁরা পেয়ে থাকেন। কিন্তু আলমগীরের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে তাঁদের এরূপ আফসোস করবার কিছুই নেই। আলমগীর শাজাহানকে যে সমস্ত পত্র লিখেছেন তাতে তাঁর সমস্ত অপবাদের যথোপযুক্ত কৈফিয়ত দেওয়া আছে। আলমগীরকে তাঁর প্রতিপক্ষ দল সর্বদাই বাক্‌পটু ও নিপুণ শিল্পীরূপে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু এক এক করে এখন তাঁর সমস্ত ঘটনাবলীই সম্মুখে উপস্থাপিত হয়েছে এবং সমস্ত গুপ্তরহস্যাবলীর বহিরাবরণও খুলে গিয়েছে। সুতরাং আলমগীরকে এখন তাঁর কৈফিয়ত পেশ করবার সুযোগ দান করা উচিত। আমি তাঁর মূল পত্রখানা খাফী খানের ভাষায় উদ্ধৃত করছি। দেখতে পাবেন, এই বাক্‌সর্বস্ব ও চাতুর্যনিপুণ ব্যক্তির একটা কথাও সত্যতার কেন্দ্র থেকে ছিটকে দূরে সরে পড়েনি।

"ভক্তি ও শ্রদ্ধান্তে হুজুরের খেদমতে আরজ এই যে, দীর্ঘকাল পর হুজুরের স্বহস্ত লিখিত পত্রখানা আমার নিকট পৌঁছেছে এবং আমি তা পাঠ করবার সৌভাগ্য লাভ করেছি। পত্রের লিখিত বিষয়গুলো সবিশেষ অবগত হলাম। চিঠিপত্রগুলো আটক করা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয়েছে। সে সম্বন্ধে হুজুরের জ্ঞানসমুদ্রের নিকট আমি নিবেদন করছি, আমি মনে করি এ অধমের প্রাথমিক অবস্থায় অর্থাৎ ঘটনাপ্রবাহের প্রারম্ভে যা কিছু সংঘটিত হয়েছে তা সমস্তই তক্‌দীরের লেখার বহিঃপ্রকাশ। হুজুর জ্ঞানী

ও বিচক্ষণ এবং জীবনের একটা বিরাট অধ্যায়ের ভিতর দিয়ে উত্থান-পতনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, সুতরাং হুজুর এটাকে অদৃষ্টের লিখন বলেই বিশ্বাস করবেন। আশা করি, আল্লার ও অপরাপর ব্যক্তিবর্গের কার্যকলাপের সঙ্গে আল্লার ইচ্ছার কোন সম্পর্ক নেই এইরূপ অভিমত পোষণ করবেন না। আমি আমার নৈতিক কর্তব্য মনে করেছিলাম ও ইচ্ছা করেছিলাম যে, চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র অপসারিত হবার পর হুজুরের মনোবেদনা অপনোদনকল্পে হুজুরের পদপ্রান্তে উপনীত হয়ে সন্দেহ নিরসন করবার চেষ্টা করব ও উভয় জগতের সৌভাগ্য লাভ করব। কিন্তু আমি যতদূর অবগত হতে পেরেছি, সমস্ত কলহ-বিবাদ ও অভিযান সৃষ্টির মূলে হুজুর স্বয়ং। ভ্রাতৃবৃন্দও হুজুরের ইঙ্গিতেই আপন আপন স্থান করে নেবার চেষ্টায় হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি করছিলেন। লোকের কথায় কান দিয়ে এ অধম আস্থাহীন হয়নি। বরং অধমের প্রতি হুজুরের অবজ্ঞার খবর উপর্যুপরি আসতে থাকল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ঐ পত্রখানা, যা হুজুর স্বহস্তে শুজার নিকট লিখেছিলেন ও যার ফলে তার ঘর-বাড়ী মান-সম্মান তার সম্মুখেই ভূলুণ্ঠিত হয়ে গেল, তা আমার এই ধারণারই পরিপোষক। এতে আমার দৃঢ় প্রত্যয় হয়েছে যে, হুজুর এ দীনকে পছন্দ করেন না। অধিকন্তু যা হস্তচ্যুত হয়ে গিয়েছে তিনি আজও তা খুঁজে ফিরছেন। তিনি ইচ্ছা করেন যে, এ অধমের শরায়ী আহকামকে বলবৎ করার ও রাজ্যের শৃঙ্খলা বিধান করার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হোক। কোনক্রমেই তিনি এ চিন্তা থেকে বিরত হননি, বরং তাঁর মতে তিনি অটল। কিন্তু উপায়ান্তরহীন হয়ে তিনি কৌশল ও সতর্কতা অবলম্বন করেছেন এবং বিপজ্জনক পথের বিপদাশঙ্কায় যা অন্তরের বাসনা ছিল, তা কার্যে পরিণত করতে পারেননি। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা আমার এ কথার সাক্ষী। ইনশা আল্লাহ এরপর থেকে বিদ্রোহীদের কার্যকলাপ যখন ঐ দুই উপায়ের যে কোন উপায়ে সমাধা করা হবে তখন কেন এই সমস্ত অকল্যাণ সংঘটিত হতে দেওয়া হবে ?

হুজুরের গৃহের পানি সরবরাহকারী ভৃত্যের ব্যবস্থাকল্পে লিখিত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখন থেকে হুজুর যেহেতু সর্বদাই মহলের

অভ্যন্তরেই বাস করতেন, তখন গোছলখানার হুজুরের পানির ব্যবস্থার কি প্রয়োজন? কৃহকার্যে মোহর প্রদান, রাজপথের সঙ্গে সংস্রব রক্ষা করা ইত্যাদি কার্যোপলক্ষে যে একজন ভৃত্য (খোজা) নিযুক্ত ছিল তদস্থলে বর্তমানে আর একজনকে নিযুক্ত করা হল। হুজুরের পোশাকাদি পূর্ববৎ যথারীতি পৌঁছতে থাকবে।" (খাফী খাঁ, ২য় খণ্ড, কলিকাতার ছাপা, পৃঃ ১০২)।

দারাশেকোর হত্যাকাণ্ড

স্বপক্ষ ও বিপক্ষ উভয় পক্ষই স্বীকার করেন যে, দারাশেকোর ভ্রান্ত প্রচেষ্টা, আত্মাভিমান ও বদ মেজাজের জন্য তিনি তৈমুরী সিংহাসনে আরোহন করবার উপযোগী ছিলেন না। ডাঃ বার্নিয়ার অপেক্ষা দারাশেকোর বড় বন্ধু আর কে হতে পারেন? গুরুতর বিপদের সময়েও তিনি তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি দারাশেকোর চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো ধারাবাহিক-ভাবে লিখেছেন :

"এতদসত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত আত্মাভিমানী ও অহঙ্কারী ছিলেন। মনে মনে তাঁর এরূপ একটা ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে, তিনি স্বীয় বুদ্ধি ও প্রচেষ্টা দ্বারা সমস্ত কাজের সুবন্দোবস্ত ও শৃঙ্খলা বিধান করে ফেলতে পারেন। তাঁকে যুক্তি ও পরামর্শ দান করতে পারেন এমন কোন জ্ঞানী লোক আছেন বলে তিনি মনে করতেন না। ভয়ে ভয়ে কেউ তাঁকে পরামর্শ দিতে গেলেও তিনি তার প্রতি অবজ্ঞা ও উপেক্ষা প্রদর্শন করতেন। এহেন অপ্রিয় ব্যবহারের জন্যই তাঁর একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুগণও তাঁর ভ্রাতৃ-বৃন্দের গোপন ষড়যন্ত্রের সংবাদও তাঁকে জানাতে পারেনি। তিনি ভীতি-প্রদর্শন ও তিরস্কার করতে বড় ওস্তাদ ছিলেন। এমনকি বড় বড় উমারা-দেরকেও তিনি ভৎ'সনা ও অপদস্ত করতে ত্রুটি করেননি। কিন্তু আবার মুহূর্তের মধ্যেই তাঁর ক্রোধ ও খিটখিটেমির অবসান ঘটত।" (বার্নিয়ারের ভ্রমণ-বৃত্তান্তের অনুবাদ, পৃঃ ১১)।

(তাহলে এই রকম হাল্‌কা স্বভাবের একজন লোক কি রাষ্ট্রের গুরুদায়িত্ব বহন করবার উপযোগী ছিলেন? —গ্রন্থকার)।

এতে কারো দ্বিমত নেই যে, ভ্রাতৃবধের সৃষ্টি তাঁরই পক্ষ থেকে হয়েছিল। আলমগীর, মুরাদ ও শুজাকে বাধ্য হয়ে তাঁর আক্রমণকে প্রতিরোধ করতে হয়েছে। এটাও তেমন দোষের কথা নয় যে, দারাশেকোকে গ্রেফতার করে দরবারে আনয়ন করা হল। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, তাঁকে কোন সুরক্ষিত স্থানে নজরবন্দী করে রাখা হল না কেন? যা সম্পূর্ণ সম্ভবপর ছিল। তিনি যতই মন্দ লোক হন না কেন, ভাই তো ছিলেন এবং বড় ভাই ছিলেন। আলমগীর যদি তাঁর রক্তে স্বীয় হস্ত রঞ্জিত না করতেন তাহলে চরিত্রের মানচিত্রে তিনি এমন কদর্যভাবে চিত্রিত হতেন না।

বাহ্যতঃ এ প্রশ্ন নিতান্তই গুরুতর, সন্দেহ নেই। কিন্তু তৈমুরী খান্দানে বরং এশীয় রাষ্ট্রগুলিতে রাষ্ট্রের দাবীদারেরা বন্দী বা নজরবন্দী হয়েও রাষ্ট্র করায়ত্ত করার চেষ্টা থেকে বিরত হননি। তাঁদের সঙ্গে তাঁদের পক্ষাবলম্বনকারী একটা দল সর্বদাই সংরক্ষিত থাকত। ততদিন পর্যন্ত তাঁরা নিশ্চল হয়ে বসে থাকেননি, যতদিন না 'আশা' বৃক্ষটার মুণ্ডপাত করা হ'ত। আপনারা সমস্ত ইতিহাসেই পড়ে থাকবেন, যখন দারাশেকো গ্রেফতার হয়ে দিল্লী এলেন এবং ঐ অবস্থায় তাঁকে বাজারে দেখা গেল তখন গোটা শহর উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল, নরনারী নির্বিশেষে অঝোরে রোদন করছিল, বালাখানার উপর থেকে সরকারী কর্মচারীদের উপর পাথর এবং ঢিলা নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল এবং মালেক জীবনের প্রতি, যে ব্যক্তি দারাকে গ্রেফতার করে এনেছিল, তার উপর গালির বৃষ্টি বর্ষণ হচ্ছিল। বাহ্য দ্রষ্টাগণ মনে করতে পারেন, এটা দারাশেকোর জনপ্রিয়তারই প্রতিক্রিয়া ছিল। কিন্তু আসলে এটা একজন বিবাদ সৃষ্টিকারীর ডিগবাজী ছাড়া আর কিছুই নয়।

খাফী খাঁ লিখছেন :

"দ্বিতীয় দিন যখন সরকারী নির্দেশে কোতোয়াল ঐ গোলমাল সৃষ্টিকারীর সন্ধানে বহির্গত হল, তখন জানা গেল যে, হায়বত নামে এক ব্যক্তির দুঃসাহসে সমগ্র শহরে এই উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল।" (খাফী খাঁ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৮৬)।

নিঃসন্দেহে আপনা-আপনিই জনসাধারণের মনের উপর এটা রেখাপাত করে থাকবে, কিন্তু তাই বলে এটা জনপ্রিয়তার লক্ষণ নয়। দারাশেকো

যে শান-শওকতের শাহজাদা ছিলেন, যে ধুমধামের সঙ্গে লোকে তাঁর গাড়ী শহরে বের হতে দেখত এবং যেভাবে তিনি টাকা-পয়সা ছড়াতে ছড়াতে বাজার পরিভ্রমণ করতেন, তদস্থলে লোকে যখন তাঁকে দুর্দশাগ্রস্ত, পদযুগল শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং অসহায় ও সঙ্গীহীন অবস্থায় বাজার অতিক্রম করতে দেখতে পেয়েছে, তখন এমন কে পাষাণ-হৃদয় আছে যে, দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ না করে থাকতে পারে? তখন কি এই বিচারের সময় ছিল যে, তিনি সিংহাসনে উপবেশন করবার উপযোগী ছিলেন কিনা? এহেন অবস্থায় শত্রুর জন্যও তো চোখে অশ্রুধারা নেমে আসে। দারাশেকো তো বরং দ্বিতীয় তৈমুরের (ছাহেব কেরানে-ছানি) জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন।

এটা অবধারিত ছিল যে, দারাশেকো যতদিন জীবিত থাকতেন ততদিন ষড়যন্ত্র চলতেই থাকত এবং দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে আসত না। সুতরাং আলমগীরকে তা-ই করতে হয়েছে যা তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর পিতার কাছ থেকে পেয়েছিলেন। শাজাহান তাঁর সহোদর ভ্রাতৃদ্বয়কে (দাদ বখশ ও শাহরিয়ার) এবং আপন ভ্রাতুষ্পুত্রদেরকে (হুশাং প্রমুখ) হত্যা করেছিলেন। সুতরাং আলমগীরের পক্ষেও এই ধরনের অমানুষিকতার প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

"এটা ঐ গোনাহ্ যা তোমাদের শহরের লোকেরাও করে থাকে।"

মুরাদের ঘটনা

মুরাদের ইতিহাস, শাজাহানকে বন্দী করা এবং দারাকে হত্যা করা অপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ। শাজাহান ও দারা উভয়েই পরিষ্কাররূপে আলমগীরের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু মুরাদ আলমগীরের হস্তপদস্বরূপ ছিলেন। যশোবন্ত সিংহের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁরই অটলতা ও মরণপণ সংগ্রাম, দারাশেকোর জয়ের পাশা উল্টিয়ে দিয়েছিল। তিনি প্রথম থেকেই আলমগীরের হিতাকাঙ্ক্ষী ও অনুগত ছিলেন এবং যা কিছু করতেন আলমগীরের ভাব লক্ষ্য করেই করতেন। এহেন জীবনপণকারী ও অনুগত সুহৃদ আলমগীরের নিকট থেকে যে পুরস্কার লাভ করলেন তাতে তিনি বন্দী হলেন এবং অবশেষে বন্দী-জীবন থেকে মুক্তি লাভ করলেন।

কিন্তু এই প্রশ্নটার এইরূপ আকার ধারণ করবার কারণ এই যে, ঐতিহাসিকেরা সম্পূর্ণ ইতিহাস বর্ণনা করেননি। 'আলমগীর নামা' এবং 'মাসেরে আলমগীরি'র গ্রন্থকার তো এই ধরনের ঘটনাবলীর কারণ সম্বন্ধে আদৌ আলোকপাত করেননি। সুতরাং তাঁদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগও নেই। কিন্তু খাফী খাঁ—যিনি এই সকল গ্রন্থকারদের উপর প্রাধান্য বিস্তারকল্পে অন্যান্য গ্রন্থাবলী থেকে বিশেষতঃ আকেল খাঁর লিখিত গ্রন্থ থেকে সমস্ত বিবরণী সংগ্রহ করেছেন, তিনিও যখন এই ঘটনা লিপিবদ্ধ করতে বসেছেন, তখন নিম্নলিখিত বর্ণনাটুকু দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছেন :

"প্রথম দিন মুহম্মদ মুরাদ বখ্‌শকে তিনি সুকৌশলে গ্রেফতার করে কয়েদ করে ফেললেন। তকৃদীর তাঁকে এ কাজে সাহায্য করেছিল এবং ঐতিহাসিকেরাও এর বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেননি। (২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩৮)।

খাফী খাঁ এর বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেননি সত্যি, কিন্তু কেন? এটা কি আলমগীরের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন, যাতে তিনি অধিকতর কলঙ্কিত না হন? কিন্তু শাজাহানকে বন্দী করার কাহিনী তো এর চেয়ে ঢের বেশী কলঙ্কময় ছিল, যা বহু সন্ধান করে খাফী খাঁ সংগ্রহ করেছেন। তিনি লিখেছেন :

"যদিও আলমগীরের ইতিহাসের তিনটি গ্রন্থের প্রত্যেক গ্রন্থকারই আলা হজরতকে তাঁরই ইচ্ছানুসারে (দুর্গাভ্যন্তরে) বন্দী করার কথা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করেছেন, কিন্তু আকেল খান-খানী তাঁরই লিখিত 'ওয়াকেয়াতে আলমগীরি' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যার সারকথা এই যে ... ...।" (পৃঃ ৩২)।

এই আকেল খাঁই মুরাদকে বন্দী করার কাহিনীও বিস্তারিতভাবে লিখেছেন। অথচ খাফী খাঁ এটাকে পরিহার করেছেন। কিন্তু কেন?

এর প্রকৃত কারণ হল, মুরাদ যদিও সাহসী, বীর ও দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ছিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত সরল প্রকৃতিরও ছিলেন এবং সহজেই লোকের কথায় প্রভাবিত হয়ে পড়তেন। দারাশেকোর সঙ্গে যুদ্ধে যখন তিনি জয়লাভ করলেন তখন লোকের প্ররোচনায় তাঁর ধারণা হয়ে গেল যে, এ যুদ্ধ তিনিই জয় করেছেন। সুতরাং তিনিই সিংহাসনের একমাত্র অধিকারী। এই ধারণার

বশবর্তী হয়ে তিনি আলমগীর থেকে সরে পড়লেন। অধিকন্তু তিনি আলমগীরের বড় বড় আমীরদেরকে মোটা বেতন ও পুরস্কারাদির লোভ দেখিয়ে দলে ভিড়াতে চেষ্টা করলেন। ফলে ২০ হাজার সৈন্য তাঁরই অশ্বারোহী দলে এসে জুটল। পক্ষান্তরে, আলমগীরের সৈন্যসংখ্যা দিন দিন হ্রাস পেতে থাকল। বাধ্য হয়ে আলমগীরকে এর প্রতিকার সাধনে ব্রতী হতে হল।

আকেল খাঁ লিখেছেন :

"এ ক্ষেত্রে শাহীমহলে প্রবেশাধিকারীদের সূত্রে জানা গেল, সুলতান মুরাদ বখ্‌শ্‌ আকবরাবাদ পরিত্যাগ করেননি, কিন্তু সম্পর্ক পরিত্যাগ করেছেন। একটা দলও যথা আলী মর্দান খানের পুত্র ইবরাহিম খাঁ আমীরুল উমারা প্রমুখ বাদশার চাকুরী ত্যাগ করেছেন এবং জনাব মুরাদ বখ্‌শের চাকুরী গ্রহণ করে তাঁরই অধীনস্থ কর্মচারীদের তালিকাভুক্ত হয়ে পড়েছেন। যে দল তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করছে যোগ্যতানুসারে দশ-পনর বিশ টাকা বেতন বাড়িয়ে দিয়ে সর্বপ্রকার সুখ-সুবিধা তাঁদের প্রদান করা হচ্ছে। এইভাবে প্রায় ২০ হাজার অশ্বারোহীর একটা বাহিনী তাঁরই পতাকা-তলে সমবেত হয়েছে। বাহ্যদ্রষ্টা ও ব্যক্তি-পূজারীর দল, যারা সত্য ও প্রকৃত তথ্য থেকে বহু দূরে, মনসবের আশায় ও নানারূপ সুবিধাদির লালসায় শাহী সৈন্যবাহিনী (আলমগীরের বাহিনী) থেকে জনাব মুরাদ বখ্‌শের দলে এসে ভিড় জমাচ্ছে। এর ফলে তাঁর সৈন্যবাহিনী দেখতে দেখতে বেড়ে চলেছে।"

এই সকল কারণে মুরাদ বখ্‌শ্‌কে দমন করতে হল। কিন্তু এটা সত্য কথা যে, আকেল খাঁর বর্ণনা মতে মুরাদকে যেভাবে গ্রেফতার করা হয়েছিল অর্থাৎ আলমগীর তাঁকে পেটের ব্যথার ভাণ করে আহ্বান করলেন। তারপর ঘুমাবার জন্য মুরাদ যখন বিশ্রামকক্ষে গমন করলেন তখন একজন বাঁদী প্রেরণ করে তাঁর হাতিয়ার চেয়ে নিলেন। শেষে শায়েখ মীরু প্রমুখকে পাঠিয়ে দিয়ে তাঁকে (ঘুমন্ত ও অস্ত্রহীন মুরাদকে) গ্রেফতার করে ফেললেন। এটা এমনই একটা কীর্তি, যা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যদিও বা সমর্থিত হতে পারে এবং মুরাদের সঙ্গে প্রকাশ্য যুদ্ধে সহস্র সহস্র লোকের প্রাণ নাশের আশঙ্কাও থাকতে পারে, তবু আলমগীর যদি অন্যান্য রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ন্যায় এটাও স্বীকার

করে নিতেন এবং মুরাদকে কৌশলে নয়, বাহুবলে পদানত করতেন তাহলে আমরা তাঁর বীরত্বের সমধিক প্রশংসা-কীর্তন করতে পারতাম। তবু স্বীকার করতে হবে যে, আলমগীর কখনো এ দাবী করেননি যে, তিনি খলীফা আবুল মনসুর আব্বাসী অপেক্ষাও অধিকতর প্রশংসার পাত্র, যিনি আব্বাসীয়া বংশের স্থপতি আবু মোসলেম ইস্পাহানীকে এইভাবেই প্রতারণাপূর্বক ডেকে এনে হত্যা করেছিলেন।

ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের ভ্রান্ত বিবরণী প্রদান

এই সকল ঘটনা সম্পর্কে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের বিবরণী ও ষড়যন্ত্র-মূলক কার্যাদির যদি কেউ রেকর্ড তৈরী করতে চান তাহলে এর জন্য একখানা স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করতে হবে। আমি প্রথম থেকে এ পর্যন্ত ইচ্ছা করেই এর আলোচনা পরিহার করে এসেছি। ভয় ছিল, এতে জড়িত হয়ে না পড়ি। কিন্তু সংযম রক্ষা করে আলোচনার শেষ পর্যায়ে যখন এসে পড়েছি, তখন নিতান্ত সংক্ষেপে হলেও দু'একটা কথা লিখে যাওয়া একান্তই প্রয়োজন মনে করি। কারণ এর ফলে উক্ত ইউরোপীয়দের ভ্রান্ত বর্ণনা, অজ্ঞতা, প্রতারণা এবং জ্ঞানে গোচরে জালিয়াতি করা সম্বন্ধে পাঠকবৃন্দের কিছুটা অনুমান হতে পারে। যদিও তাঁরা শাজাহান, দারাশেকো ও মুরাদ, প্রত্যেকেরই ইতিহাস একইভাবে বিকৃত করে গিয়েছেন, তবু সংক্ষেপ-সাধন মানসে শুধু মুরাদের বিষয়টা আলোচনা করেই ক্ষান্ত হচ্ছি।

(১) ইউরোপীয় ঐতিহাসিক মাত্রেই লিখেছেন যে, শাজাহানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং দারাশেকোর সঙ্গে লড়াই করার জন্য মুরাদকে আলমগীরই উত্তেজিত করেছিলেন। নানাপ্রকারে উস্কানি প্রদান করে তাঁকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন; কিন্তু ঐতিহাসিক গ্রন্থাদি ছাড়াও মুরাদের নিজস্ব পত্রাবলী সংরক্ষিত আছে। তাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, আলমগীর তাঁর স্থান থেকে একটুও নড়তে চাননি। বরং পুনঃপুনঃ মুরাদকে অগ্রসর হতে বাধা দান করছিলেন। মুরাদ তাঁর একখানা পত্রে, যা ২৩শে সফর তারিখে অর্থাৎ শাজাহানের অসুস্থ হওয়ার দুইমাস পর আলমগীরকে লিখেছিলেন, সমস্ত ঘটনা জ্ঞাপন করে আলমগীরকে যুদ্ধে যোগদান করবার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। তাতে লেখা ছিল:

"আপনিও যদি এদিকে মনোযোগ প্রদান করেন তবে উত্তম। অন্যথায় এ অধম এই বিরত থাকার ব্যাপারে কোনক্রমেই ধৈর্য রক্ষা করতে পারবে না।"

আলমগীর যখন এই সকল পত্রের উত্তরে লিখলেন যে, হুজুরে আক্‌দাস এখনও জীবিত আছেন। সুতরাং আমার ও আপনাদের পক্ষে স্ব স্ব স্থান ত্যাগ করা উচিত হবে না। অধিকন্তু, আপনি যদি সুরাট বন্দর আক্রমণ না করতেন তবেই ভাল হ'ত। এর উত্তরে কিন্তু মুরাদ তাঁর একাধিক পত্রে আলমগীরকে আগ্রার পথে অগ্রসর হতে উৎসাহিত করেন। ১০ই রবিউল আউয়াল তারিখে লিখিত একখানা পত্রে তিনি লিখেছিলেন ঃ

"আপনার কথায় ও লেখায় জানতে পারলাম আপনি সেই ঘটনা অর্থাৎ পিতা শাজাহানের মৃত্যু সংঘটিত হওয়া সম্পর্কে চিন্তা করে ইতঃস্তত করছেন। কিন্তু আমার নিকট তা যুক্তিযুক্ত মনে হচ্ছে না। যাহোক, এ বিষয়ে যা কিছু করণীয় তা নিশ্চিত হয়েই স্থির করা উচিত ছিল। এখন যা কাজে পরিণত করা হয়ে গিয়েছে তা থেকে প্রত্যাবর্তন করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়।"

তারপর আর এক পত্রে লিখেছেন ঃ

"পত্রে যা কিছু সন্নিবেশিত হয়েছে অর্থাৎ এখন পর্যন্ত যেহেতু অবশ্যম্ভাবী ঘটনাটা (শাজাহানের মৃত্যু) ঘটবার সংবাদ আমাদের কাছে পৌঁছেনি বরং তাঁর স্বাস্থ্যোন্নতির লক্ষণই প্রকাশ পাচ্ছে, তখন নিজ নিজ স্থান ত্যাগ করা এবং মর্যাদা ও পদাদির অধিকারে নিয়োজিত হওয়া আমাদের পক্ষে সমীচীন নয়। তাছাড়া আপনি যদি যথারীতি সন্ধান নেবার পর সুরাটে সৈন্য প্রেরণ করতেন এবং এ কাজে অগ্রসর হতেন, সেটাই ভাল হত।" (এই পর্যন্ত মুরাদ আলমগীরের বাণী নকল করেছেন। তারপর বলছেন), "বস্তুতঃ আমাদের প্রতিনিধিবর্গের লিখিত পত্রাদির মর্ম যথোচিত ভেবে দেখা উচিত। বর্তমান পরিস্থিতিতে কোন কিছুতেই বিশ্বাস স্থাপন করা চলে না। কেন না, (ক) গুপ্তচরদের রিপোর্টে বিশ্বস্তভাবে জানা গেল, জিলহজ্জ মাসের মাঝামাঝি হজরত পরলোকগমন করেছেন এবং (খ) আমার ভ্রাতৃবৃন্দের প্রতিনিধিরা প্রকৃত প্রস্তাবে নজরবন্দী হয়ে আছেন।

যাহোক, এই উভয়বিধ অবস্থাতেই সংবাদের অপেক্ষা করা, সময় ও সুযোগকে হাতছাড়া করা, শত্রুর সঙ্গে আলোচনায় বাজী রাখা এবং তার বশ্যতা স্বীকার করা আদৌ মন চায় না।"

ঐ পত্রের শেষে লিখেছেন :

"এই সমস্ত ব্যাপারের সারকথা এই যে, আমি আমার কার্যাবলীর পূর্ণ সমাধান যুদ্ধ ও সংগ্রামের ভিতরেই নিহিত মনে করি। বিধায়, আমি সর্বত্র যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছি। ইহা ব্যতীত অন্য কোন চিন্তাই আমার নেই বা মনের আশেপাশে আর কোন ধারণাও নেই। যদি আপনার ন্যায় মহিমান্বিত ব্যক্তির মতামতের অপেক্ষা আমাকে না করতে হ'ত তাহলে এতদিন আমি ঐ সকল অঞ্চলে পৌঁছে যেতাম।" (রবিউল আউয়াল মাসে লিখিত)।

এতদসত্ত্বেও আলমগীর বার বার মুরাদকে বাধা প্রদান করছেন। পক্ষান্তরে মুরাদ অগ্রসর হওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তিনি আর এক পত্রে লিখছেন :

"আপনার অনুমতি ব্যতিরেকে আর কোন অন্তরায় আমার নেই।"

এরপর মুরাদ যখন সুরাটের দুর্গ অধিকার করে নিলেন, তখন ১৮ই রবিউস-সানি তারিখে আলমগীরকে এক পত্রে লিখছেন :

"যে সৈন্যবাহিনী সেখানে অর্থাৎ সুরাটে নিয়োজিত ছিল তারা শীঘ্রই হুজুরের নিকট পৌঁছে যাচ্ছে। তারা হুজুরের পরামর্শ ও অনুমতির অপেক্ষা করছে।"

উক্ত ১০ই রবিউস-সানি তারিখে আলমগীরকে আবার লিখছেন :

"আপনি অবশ্য ঐ অঞ্চলে জরুরী প্রয়োজনে সংবাদাদি যাচাই করবার জন্য বিচলিত মনে সময়টাকে ব্যয় করছেন। কিন্তু দিন আমাদের যতই যাচ্ছে, শত্রু (অর্থাৎ দারাশেকো) ততই দৃঢ়তা লাভ করছে। এটা নিশ্চিত যে, হজরতে আলা শাজাহান তাঁর স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁকে মুলহেদ দারাশেকো তাঁর ফাঁদে আবদ্ধ করে ফেলেছেন। কেননা আমাদেরকে লণ্ডভণ্ড করে দেবার অভিপ্রায়েই ভ্রাতৃবর সুজার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করা হয়েছে। যে কোন উপায়েই হোক উক্ত মুলহেদকে আমাদের মধ্য থেকে বিতাড়িত করে হজরতে আলা শাজাহানকে ওর কবল থেকে উদ্ধার

করে আনব। যাহোক, সঙ্কল্পে অটল থাকাই শ্রেয়। যদি এ ব্যবস্থা আপনার মনঃপূত হয় তাহলে শ্রদ্ধেয় ভ্রাতৃবর সুজাকে এই ব্যাপারে একমত করে একই সময়ে আপন আপন স্থান থেকে আমাদের উদ্দেশ্যের পথে আমরা রওয়ানা হব।"

এই ধরনের আরো বহু পত্রাদি রয়েছে যাতে স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হয় যে, আলমগীর বার বার বাধা প্রদান করছেন এবং বলছেন যে, হুজুরে আকদাসের জীবনকাল পর্যন্ত তাঁদেরকে নিজ নিজ স্থানেই অবস্থান করা উচিত। কিন্তু মুরাদ কখনো বলেন যে, সত্য সত্যই শাজাহান মহাপ্রস্থান করেছেন; আবার কখনো বলেন যে, জীবিত থাকলেও তিনি দারাশেকোর কবলে পতিত হয়ে আছেন। আবার কখনো বা লেখেন যে, তিনি যে সঙ্কল্প গ্রহণ করেছেন তা করবেনই। তাতে যদি আলমগীর সহযোগিতা করেন তো উত্তম, অন্যথায় তিনি একাই ঐ পথের পথিক হবেন।

এই সকল ব্যাখ্যা প্রদান করবার পর বিচার করে দেখুন, ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের অথবা খাফী খানের এই বর্ণনা কতদূর সত্য। (১) আলমগীর মুরাদকে আশা-ভরসা প্রদান করে তাঁর সঙ্গে যোগদান করার জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। (২) ইউরোপীয় ইতিহাস লেখকেরা সাধারণতঃ লিখে থাকেন যে, আলমগীর মুরাদের সঙ্গে এইরূপ একটা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন যে, রাজত্ব তাঁর হস্তেই ন্যস্ত করা হবে এবং আলমগীর দারাশেকোর মূলোচ্ছেদ করবার পর হজ যাত্রা করবেন। বার্নিয়ার সাহেব লিখেছেন যে, মূলতঃ এই কারণেই আলমগীর সর্বদা মুরাদকে 'হজরত' বলে আহ্বান করতেন। খাফী খানের লেখার ধরন থেকেও বুঝা যায় যে, মুরাদকে রাজত্বের লোভ দেখানো হয়েছিল; কিন্তু এটা একটা গুরুতর ঐতিহাসিক প্রমাদ। অবশ্য তিন ভাইয়ের মধ্যে একটা চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। কিন্তু খাফী খাঁ ও ইউরোপীয়রা এটা অনুসন্ধান করে দেখার প্রয়োজন বোধ করেননি যে, ওটা কি ধরনের চুক্তি ছিল। মির্জা মুরাদ তাঁর চিঠিপত্রে, যা আলমগীর ও সুজাকে লিখেছিলেন, তার স্থানে স্থানে এর আভাস দিয়েছিলেন। চুক্তিপত্রখানার মর্ম এই যে, দারাশেকো যদি তাঁদের কোন এক ভাইয়ের উপর চড়াও হন,

তাহলে অন্যান্য ভ্রাতৃবৃন্দ তাঁর সাহায্যে অগ্রসর হবেন। যেহেতু এক পত্রে তিনি (মুরাদ) লিখেছেন :

"আমাদের মধ্যে যে চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়েছে তার শর্ত এই যে, যখনই মুলহেদ দারাশেকো যে কোন এক ভাইয়ের সঙ্গে কলহে লিপ্ত হবেন তখনই আর আর ভাইয়েরা তাঁকে সাহায্য করবেন।"

এ ছাড়া চুক্তিপত্রের অন্তর্ভুক্ত এও ছিল যে, যুদ্ধ জয়ের পর মালে-গনিমতের এক-তৃতীয়াংশ এবং কাবুল, পাঞ্জাব ও কাশমীর রাজ্যগুলো মুরাদকে প্রদান করা হবে। আকেল খাঁ তাঁর গ্রন্থ ওয়াকেয়াতে আলমগীরিতে লিখেছেন :

"স্থিরিকৃত হল যে, যুদ্ধে প্রাপ্ত মালে-গনিমতের এক-তৃতীয়াংশ সুলতানকে (মুরাদকে) এবং দুই-তৃতীয়াংশ দানশীল সরকারকে (আলমগীরকে) প্রত্যর্পণ করা হবে। হজরত ছাহেব কেরানের (শাজাহানের) সমগ্র রাজ্য তথা হিন্দুস্তানের গোটা সাম্রাজ্য অধিকার করবার পর পাঞ্জাব, মুলতান, কাশমীর ও কাবুল রাজ্যগুলি জনাব সুলতানীর (মুরাদের) অধিকারভুক্ত হবে। তিনি উল্লেখিত রাজ্যগুলিতে রাষ্ট্রীয় পতাকা উড্ডীন করতে পারবেন। তিনি শাসন ক্ষমতার ড্রাম বাজাতে এবং নিজ নামে খুৎবা ও মুদ্রা চালু করতে পারবেন।"

দারাশেকোর পরাজয়ের পর মুরাদ যখন আলমগীরের প্রতি নারাজ হয়ে পড়লেন এবং তাঁর কাছ থেকে পৃথক হয়ে গেলেন, আলমগীর তখনও ঐ চুক্তিসূত্রে নগদ ২০ লক্ষ টাকা মুরাদকে প্রেরণ করলেন। আরো বলে পাঠালেন যে, দারাশেকোর প্রশ্ন মীমাংসিত হবার পর কাবুল, পাঞ্জাব এবং কাশমীরও তাঁর হাতে অর্পণ করা হবে।

আকেল খাঁ লিখেছেন :

"বিধায় তিনি (আলমগীর) নগদ ২০ লক্ষ টাকা তাঁর জন্য প্রেরণ করলেন ও সংবাদ পাঠালেন যে, উপস্থিতে তিনি যেন ঐ টাকাটা তাঁর নিজস্ব সৈন্যবাহিনীর জরুরী প্রয়োজনে ব্যয় করেন। অপরাপর বিষয়গুলি অর্থাৎ মালে-গনিমতের এক-তৃতীয়াংশ ইত্যাদি যা তাঁর জন্য ধার্য করা হয়েছে, যথারীতি তাঁর সরকারে পৌঁছে যাবে এবং চুক্তিপত্রের শর্তাবলী যথানিয়মে সম্পন্ন করা হবে। ইনশা আল্লাহ দারাশেকোর প্রশ্নটার মীমাংসা

হয়ে গেলেই পাঞ্জাব, কাবুল ও কাশ্মীর রাজ্যগুলিও তাঁর হাতে ন্যস্ত করা হবে।"

এই সকল তথ্যের মোকাবেলায় ডাঃ বার্নিয়ার এবং অন্যান্য ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের বর্ণনা অর্থাৎ 'আলমগীর মুরাদকে এমন সব প্রলোভন দেখিয়েছিলেন যে, হিন্দুস্তানের রাজত্বের উপযোগী তিনিই একমাত্র ব্যক্তি এবং আলমগীর তাঁকে সিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে স্বয়ং গৃহকোণে তপস্যায় মনোনিবেশ করবেন',—কি রকম সুস্পষ্ট মিথ্যা ও অপবাদ? ডাঃ বার্নিয়ার এই বিষয়টাকে বেশ জোড়েশোরে বারংবার বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন:

"আওরঙ্গজেব যদিও বাহ্যতঃ মুরাদ বখ্‌শ্‌কে বরাবর শাহে হিন্দুস্তান বলে সম্বোধন করতেন এবং খলীলুল্লাহকেও বলেছিলেন যে, শুধু হজরতই সিংহাসনে উপবেশন করবার যোগ্য।" (পৃঃ ১০৪)।

ডাঃ প্রবর বলছেন যে, আলমগীর মুরাদকে একখানা পত্র লিখেছিলেন, যার হুবহু কয়েকটা পংক্তি ছিল এইরূপ :

"ভ্রাতৃবর! আপনাকে একথা স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই যে, রাষ্ট্রীয় গুরুভার বহন করবার মত কষ্ট স্বীকার করা বাস্তবিক আমার স্বভাব ও চরিত্রের একান্তই বিরোধী। আমি রাজত্বের অধিকার ও দাবী-দাওয়া থেকে সম্পূর্ণ অপসারিত হয়ে যাচ্ছি। পক্ষান্তরে দারাশেকো রাজ্য পরিচালনা করবার গুণাবলী থেকে সম্পূর্ণ নিঃস্ব, বরং ধর্মহীন ও কাফের; বিধায় সে সিংহাসনারোহন ও মুকুট ধারণের একান্তই অনুপযুক্ত। সুতরাং এমতাবস্থায় এই বিরাট রাজ্যের রাজকার্য পরিচালনভার গ্রহণ করবার যোগ্য ব্যক্তি একমাত্র আপনিই। আমার সম্বন্ধে আপনি মনে রাখবেন, আপনার পক্ষ থেকে যদি এরূপ দৃঢ় প্রতিশ্রুতি পেয়ে যাই যে, খোদার অনুগ্রহে আপনি রাজত্ব লাভ করলে আমাকে নিশ্চিন্তে এবাদত-বন্দেগী করবার উদ্দেশ্যে আপনার রাজ্যমধ্যে একটা নির্জন স্থান প্রদান করবেন, তাহলে (আমার পরামর্শ এই যে) আপনি কালবিলম্ব না করে সুযোগের সদ্ব্যবহার করুন ও সুরাট দুর্গ অধিকার করে ফেলুন।"

এখন বিচার করে দেখুন, ডাঃ সাহেবের এই সকল বয়ান কতখানি বিশ্বাসযোগ্য? বিশেষতঃ এই বর্ণনা, 'অগোণে সুরাট দখল করে ফেলুন, কাল-

বিলম্ব করবেন না'—কতদূর সত্য? কারণ, খোদ মুরাদের পত্রাবলীতে একথা পরিষ্কার জানা গিয়েছে যে, আলমগীর মুরাদকে অগ্রসর হতে মাসের পর মাস বাধা দিয়ে এসেছেন। বিশেষ করে সুরাট আক্রমণ সম্পর্কে পরিষ্কার লিখেছেন, 'ওটা অনুচিত ছিল।' অথচ ডাঃ বার্নিয়ার উল্টা আলমগীরকেই মুরাদের অগ্রাভিযানের প্রস্তাবক সাজিয়েছেন। আমাদের তাহলে মুরাদ, না ডাঃ বার্নিয়ার, কার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত?

(৩) সমস্ত ইউরোপীয় ইতিহাস লেখকেরা লিখেছেন যে, আলমগীর মুরাদকে শরাব পান করিয়ে গ্রেফতার করেছিলেন। কিন্তু ডাঃ বার্নিয়ার ব্যতীত আর কোন লেখকই এই শরাব পান করানো সম্পর্কে একটা অক্ষরও (প্রমাণস্বরূপ) লেখেননি। মজার ব্যাপার এই যে, বোম্বাইয়ের গভর্নর এলফিনিস্টন সাহেব তাঁর রচিত ভারতের ইতিহাসের এক নোটে লিখেছেন :

"যদিও বার্নিয়ার সাহেব এর নিকটবর্তী কোন এক সময়ে জীবিত ছিলেন এবং তিনি একজন সুলেখক ছিলেন, কিন্তু সম্ভবতঃ তাঁর 'মৌখিক ও লিখন' জ্ঞান সীমাবদ্ধ ছিল এবং হিন্দুস্তানীদেব প্রতি মত প্রকাশের উপায় ও সূত্র খুব কমই জানা ছিল। তাছাড়া তাঁর বর্ণনায় এমন সমস্ত গল্পের আমদানী দেখা যায় যা মনগড়া বলেই মনে হয়।" (আলীগড়ী ছাপা, পৃঃ ৯৯৯)।

এলফিনিস্টন সাহেব ডাঃ বার্নিয়ার সম্পর্কে খুব সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করেছেন বটে, কিন্তু আফসোসের বিষয় এই যে, তাঁর নিকট বার্নিয়ারের বর্ণনা ঐ পর্যন্তই অবিশ্বাস্য, যে পর্যন্ত তিনি আলমগীরের অনুকূলে মত প্রকাশ করেছেন। অন্যথায়, আলমগীরের বিরোধিতায় তাঁর (বার্নিয়ারের) প্রত্যেকটা অক্ষর অহী বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। শুধু এলফিনিস্টন সাহেব কেন, ইউরোপীয় ঐতিহাসিক মাত্রেই বার্নিয়ারের গ্রন্থকে আসমানী কেতাব বলে গণ্য করে থাকেন।

পাঠকবৃন্দ! আলমগীরের অপবাদগুলোর একটা পূর্ণ বিবরণী আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হল। মনোযোগ সহকারে পাঠ করুন এবং বার বার পাঠ করুন। প্রত্যেকটা ঘটনা পরীক্ষা করুন দেখতে পাবেন, আলমগীরকে হেয়-প্রতিপন্ন করবার অপচেষ্টায় বিরোধী ঐতিহাসিকের দল কি রকম ভ্রান্তিপূর্ণ

বর্ণনা প্রদান করেছেন, কি কি উপায়ে আসল ঘটনাকে বিকৃত আকারে প্রকাশ করেছেন, কি রকম ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং কেমন প্রতারণাপূর্ণ উপায়ে তাঁদের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করেছেন।

আলমগীর কেন, যদি নওশেরোঁয়ার বিরুদ্ধেও ইত্যাকার প্রচেষ্টা চালান হত, তাহলে তিনিও একটা আস্ত শয়তানে পরিণত হতেন।

শিক্ষা গ্রহণ

আলমগীরের বন্ধুদের মধ্যে একজন হচ্ছেন লেনপুল সাহেব। তিনি আলমগীরের একখানা ইতিহাস রচনা করেছেন। তিনি নিজের জ্ঞানসূত্রে আলমগীরের সমস্ত অপবাদের কৈফিয়ত দিতে এবং তাঁকে প্রশংসার পাত্র প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন বটে, কিন্তু তার পন্থা অবলম্বন করেছেন আলমগীরের সর্বপ্রকারের অন্যায়, অর্থাৎ দারাশেকো প্রমুখের হত্যা, হিন্দু রাজ্যগুলোর সঙ্গে গোলমাল করে আপন রাষ্ট্রের ভিত্তিমূল প্রকম্পিত করে তোলা, মন্দিরও ভেঙ্গে দেওয়া, হিন্দুদেরকে চাকুরী থেকে বঞ্চিত করা, দাক্ষিণাত্যের ইসলামী রাজ্যগুলোকে ধ্বংস করে দেওয়া, মারহাট্টাদের পশ্চাতে স্বীয় সৈন্য ও রাষ্ট্র বিনাশ করা ইত্যাদি ইত্যাদি প্রমাণ করে। তিনি লিখেছেন, আলমগীর যেহেতু একজন নিতান্ত দ্বীনদার ও নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন, সুতরাং ধর্মীয় কর্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এটা তাঁর প্রতি ফরজ ছিল। তিনি তাঁর বহু মন্তব্যের মধ্যে এক স্থানে লিখেছেন :

"মুঘল সুলতানদের ইতিহাসে ইনিই সর্বপ্রথম বাদশাহ, যিনি একজন পাকা মুসলমান ছিলেন। ইনি স্বয়ং নিষিদ্ধ কার্যাবলী থেকে বিরত থাকতেন ও সংশ্লিষ্ট সকলকেই বিরত রাখতেন। তিনি ঐ বাদশাহ ছিলেন, যিনি ধর্মের খাতিরে সিংহাসনকে সঙ্কটের মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন। তিনি ভালভাবেই জানতেন যে, বিভিন্ন জাতি ও পরস্পরবিরোধী ধর্মাবলম্বীদের সমন্বয়ে গঠিত রাষ্ট্রগুলির স্থায়িত্বের জন্য মেলামেশা ও বুঝাপড়াই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ পন্থা। পক্ষান্তরে, তিনি নিশ্চয়ই ঐ বিপদসঙ্কুল পথ সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত ছিলেন, যে পথে তিনি পদসঞ্চালন করেছিলেন। এটাও নিশ্চয়ই জানতেন যে, হিন্দুদের প্রত্যেকটা চিন্তাধারা থেকেই দূরে সরে

থাকা এবং ইরানী অনুচরবর্গ, যাঁরা তাঁর সৈন্যদলে ও দরবারে বড় বড় সরদাররূপে বিরাজিত ছিলেন, প্রকাশ্যভাবে তাঁদের সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত হয়ে শত্রু করে তোলা প্রকারান্তরে বিদ্রোহকে স্বহস্তে আহ্বান করারই নামান্তর। তথাপি তিনি এই পথই বেছে নিয়েছিলেন এবং অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে পঞ্চদশ বর্ষ ব্যাপী অতুলনীয় রাজত্বকাল মধ্যে এই পথেই চলেছিলেন। এই সমস্ত কার্যকলাপ আওরঙ্গজেব কোন গভীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে করেননি, বরং এগুলো তিনি সত্যই ন্যায় ও সঙ্গত বুঝেছিলেন।" (লেনপুলের অনুবাদ, পৃঃ ৬৩ ও ৬৪)।

অন্য এক স্থানে তিনি লিখেছেন :

"আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে অকৃতকার্যতা অবশ্যই ঘটেছে, কিন্তু তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। দুনিয়াদারীর সকল পথই তিনি তাঁর ঈমানদারীর সম্মুখে রহিত করে দিয়েছিলেন। তাঁর ফরজ আদায় করার পথটাকেই তিনি বেছে নিয়েছিলেন, যদিও সেটা সুনিশ্চিতভাবে অপ্রযোজ্য ছিল, তবু অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে সেই পথেই চলেছিলেন। তিনি যদি একজন দুনিয়াদার হতে পারতেন তাহলে নিঃসন্দেহে তাঁর গন্তব্যপথ নিরঙ্কুশভাবে কুসুমাস্তীর্ণ হত। কিন্তু তাঁর মর্যাদা ও কামনা-বাসনা তাঁর বিবেককে বিসর্জন না দেওয়া ও নীতিশাস্ত্রের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করার ভিতরেই নিহিত ছিল। হিন্দুস্তানের এই শ্রেষ্ঠ দীনদার ব্যক্তি এমন প্রতিভাবান ছিলেন যে তিনি শহীদানদের জয়মুকুট লাভ করেছিলেন।" (পৃঃ ২০১)।

লেনপুল সাহেবের এহেন অনুগ্রহে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। তিনি একজন ইউরোপীয় ঐতিহাসিক। এই তাঁর করণীয় ছিল। কিন্তু চিন্তার বিষয় এই যে, নব্যশিক্ষিত একটা দল লেনপুল সাহেবের গ্রন্থখানাকে আলমগীরের হিতৈষণামূলকই মনে করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, এক ভদ্রলোক ওর উর্দু অনুবাদ বের করেছেন এবং একজন প্রখ্যাত ও বিশিষ্ট বুজুর্গের নামে ভূমিকা প্রকাশ করে বুঝাতে চেয়েছেন যে, এটা একটা ইসলামী খেদমত।

"নির্বুদ্ধিতা হেতু সে সর্বদাই আমার কাজের ক্ষতি করে এসেছে,
কিন্তু বিস্ময়কর এই যে, সে আমাকে বুঝাতে চাচ্ছে যে, এটা তার
অনন্ত অনুগ্রহ।"

"তার দোষগুলো যদি সবই বললে তাহলে তার গুণগুলোও বল।"

একটা সুদীর্ঘ কাহিনী যার উপসংহার রচনা করতে দীর্ঘকাল লেগে গেল। সারকথা শুধু এইটুকুই পাওয়া গেল যে, আলমগীর ততখানি দোষী ছিলেন না, যতখানি তাঁর বিপক্ষ দল তাঁকে মনে করে।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, আলমগীরের কি এইটুকুই মাত্র পাওনা, তাঁকে কি এতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে যে, "প্রশংসা না হোক, দুর্নাম না হয়?" অবশ্য বিপক্ষ ঐতিহাসিকদের নিকট সত্যের খাতিরে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা উচিত যে, তাঁরা আলমগীরের দোষগুলো প্রাণভরে লিখলেও তাঁর গুণাবলী স্বীকার করতেও দ্বিধা বোধ করেননি। কিন্তু দোষের শিঙ্গা এত জোরে ফুঁকেছেন যে, গুণাবলীর আওয়াজ কানেই পৌঁছিল না। যাহোক, কলঙ্কের গগন থেকে যখন অন্ধকার কিছুটা অপসারিত হয়ে গেল তখন পাঠকবৃন্দের সম্মুখে তাঁর প্রকৃত গুণাবলী তুলে ধরা যাক।

রাজ্য সংস্কার ও রাজ্য শৃঙ্খলা

তৈমুর তাঁর স্থলাভিষিক্তদের কীর্তিকলাপের ভিতর চিরদিনই যুদ্ধ জয় ও রাজ্য বিস্তার খুঁজে থাকবেন। একমাত্র আলমগীরই দক্ষতার সঙ্গে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন। তিনি আসাম ও তিব্বত অধিকার করে নিয়েছেন। দাক্ষিণাত্যের দু'টো রাজ্যও তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত করে নিয়েছেন। মোটকথা, তাঁর শাসনকালে তৈমুরী সাম্রাজ্যের যা প্রসার ঘটেছিল, তা আর কারও কালেই ঘটেনি। তবু আলমগীরের রাজত্বের ইতিহাসে তৈমুরের অভিরুচি অনুসরণ করবার প্রয়োজন আমাদের নেই। কারণ চেঙ্গিজ খাঁও দেশ জয় করেছিলেন, আলেকজাণ্ডারও দিগ্বিজয়ী সম্রাট ছিলেন; কিন্তু আমার বিচারার্থ বিষয়, রাজ্যে শৃঙ্খলা স্থাপনকল্পে আলমগীর কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। নীচে বিবরণ দেয়া যেতে পারে।

ট্যাক্স রহিতকরণ

অন্যান্য বাদশাহদের আমলে জমির খাজনা ছাড়াও বহু প্রকারের বাজে ট্যাক্স ও মাশুল আদায় করা হ'ত। যা সবলগে প্রায় খাজনার সমান সমান হ'ত। তা যথাক্রমে টুঙ্গী, পান্দ্রী (বাড়ীর ট্যাক্স), সরশুমারী, বরশুমারী, বরগাদী, তুফানা, জরিমানা, শনকারানা প্রভৃতি। ইত্যাকার প্রায় ৮০ রকম ট্যাক্স আদায় করা হত এবং তার আয় খাফী খাঁর মতে কোটি কোটি টাকার ঊর্ধ্বে ছিল। এই সমস্ত মাশুল আলমগীর একদম বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

মালগুজারী অর্থাৎ খাজনার আইন ও জমির বন্দোবস্ত

আকবরের সময়ে খাজনা ও খেরাজের যে আইন রচিত হয়েছিল, পুনরায় তার সংস্কার ও সংশোধন আর কোনদিনই হয়নি। আলমগীর তাঁর

রাজত্বকালে সংস্কৃত ও সংশোধিত এক নূতন প্রথার প্রবর্তন করলেন। আমার এক বাঙালী বন্ধু পাটনা কলেজের অধ্যাপক যদুনাথ সরকার, ইংরেজী অনুবাদ-সহ এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে ছাপিয়েছেন। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কায় আমি সেটা নকল করতে পারলাম না। কিন্তু এখানে এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আলমগীরের শাসনকালে সাম্রাজ্যের খাজনাদির আয় এত বেড়ে গিয়েছিল যে, মহান আকবরের রাজত্বকাল থেকে ঐ সময় পর্যন্ত এত আয় আর কোন দিন হয়নি। আমি যথাক্রমে রাজত্বের পর রাজত্বের হিসাব বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করছি। (লেনপুল, পৃঃ ১১৬ ও ১১৭, তিনি বিশ্বস্তভাবে এ সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট প্রণয়ন করেছেন) ঃ

আকবর—১ কোটি ৯০ লক্ষ পাউণ্ড।

শাজাহান—২ কোটি ২৭ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড।

আলমগীর—৪ কোটি পাউণ্ড অর্থাৎ ৬০ কোটি টাকা।

যে সমস্ত দেশ নিয়ে আলমগীরের রাজ্যসীমা বর্ধিত হয়েছিল, তা ছিল হায়দ্রাবাদ, বিজাপুর, আসাম, চট্টগ্রাম ও তিব্বত। কিন্তু উল্লিখিত সমস্ত রাজ্যের মোট আয় ১০/১২ কোটি টাকার অধিক হতে পারত না। অবশিষ্ট বর্ধিত আয় শুধু আয় বৃদ্ধির সুবন্দোবস্ত ও দেশের আবাদী বাড়াবার ফলেই ঘটেছিল, বলা যেতে পারে।

রাজকর্মচারীদের মৃত্যুর পর তাঁদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ রহিত করা

আলমগীরের আমল পর্যন্ত সাধারণভাবে প্রচলিত প্রথানুসারে এই নিয়ম চলে এসেছিল যে, যখন রাজ্যের বিশিষ্ট কর্মচারী মৃত্যুমুখে পতিত হতেন, তখন তাঁর সমস্ত সম্পত্তি এবং আসবাবপত্র বাজেয়াপ্ত হয়ে শাহী ট্রেজারীতে জমা হ'ত। যদিও এই প্রথা আজকের দিনে অত্যাচারমূলক বলেই বিবেচিত, কিন্তু সে আমলে তা হয়নি। তাছাড়া সত্যিকার কিছু কারণও হয়ত এর

পেছনে ছিল। তবু সন্দেহ নেই যে, এই প্রথা অনেক প্রকার অন্যায় ও নিষ্ঠুরতার উৎস হয়ে পড়েছিল।

'মাসেরে আলমগীরি' ৫০১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে :

"বড় বড় আমীরদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ, যা আলমগীর সরকার প্রবর্তন করেননি, বরং পূর্ববর্তী বাদশাহদের আমলে শাহী পেশকারেরা উক্ত আমীরদের উত্তরাধিকারীদের নিকট থেকে যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে বাজেয়াপ্ত করে নিতেন এবং যা মাতমকারীদের, তাদের আত্মীয়-স্বজনদের ও প্রতিবেশীদের দুঃখের কারণ হত, তা (বর্তমান সরকার কর্তৃক) রহিত করে দেওয়া হয়েছিল।"

খাফী খাঁ ও লেনপুল কেউই প্রকৃত ঘটনাকে আবিষ্কার করেননি। কিন্তু তাঁরা বলেন যে, এই আদেশের যথাযথ প্রতিপালন হয়নি। কারণ, আলমগীরের আমীরেরা তাঁর আদেশাবলীর সম্পূর্ণ প্রতিপালন করতেন না। অবশ্য এ বিচারের ভার পর্যবেক্ষকদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে।

সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কাজ, সম্ভবতঃ ইসলামী জগতের ইতিহাসে এরূপ আর একটিও নজির নেই, সেটা হচ্ছে এই যে, স্বয়ং বাদশার বিরুদ্ধে যদি কারও কোন অভিযোগ থাকত তা হলে, না তার প্রতিকার করবার কোন ক্ষমতা ছিল, না এরূপ কোন ব্যবস্থাই প্রবর্তিত ছিল। আলমগীর ১০৮২ হিজরী সনে এক আদেশ জারি করলেন যে, জেলায় জেলায় সরকারী প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হোক এবং সর্বসাধারণকে জানিয়ে দেওয়া হোক যে, স্বয়ং বাদশাহর বিরুদ্ধেও যারই যে কোন অভিযোগ থাক না কেন, সে তা পেশ করতে পারবে এবং সরকারী প্রতিনিধি তার কৈফিয়ত প্রদান করবেন। তার দাবী যদি প্রমাণিত হয় তা হলে সরকারী প্রতিনিধির কাছ থেকে তার অধিকার আদায় করতে পারবে। (পৃঃ ২৪৯)।

খাফী খাঁ লিখছেন :

"এই বৎসরে বাদশাহ ন্যায়ের মর্যাদা দান ও সুবিচার প্রদানের ব্যবস্থাকল্পে এই মর্মে আদেশ জারি করলেন যে, রাজধানী ও অন্যান্য শহরে ঘোষণা করে দেওয়া হোক—কোন ব্যক্তির যদি স্বয়ং বাদশার বিরুদ্ধেও কোন অভিযোগ বা শরায়ী দাবী-দাওয়া থাকে, সে যেন বাদশার প্রতিনিধির

নিকট উপস্থিত হয় ও তার দাবী পেশ করে। তার দাবী যদি প্রমাণিত হয় তাহলে উক্ত প্রতিনিধির নিকট থেকে তার দাবী আদায় করে নেবে। তিনি আরও ঘোষণা করলেন যে, যারা রাজধানীতে উপস্থিত হতে অসমর্থ তাদের অভিযোগের বিচার প্রদানকল্পে রাজধানীতে ও অন্যান্য শহরে, নিকটে ও দূরে এবং সমস্ত সুবাগুলিতে শরায়ী প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হোক।"

সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ও রিপোর্টারগণ

সাম্রাজ্য ও প্রজাপুঞ্জের অবস্থা সম্যক অবগত হওয়ার জন্য তিনি রিপোর্টার ও সংবাদ সরবরাহ বিভাগের বিপুল বিস্তার সাধন করলেন। অবশ্য এতে সন্দেহ নেই যে, এ বিভাগটি বিপদমুক্ত নয়। কেননা রিপোর্টার যদি স্বার্থপর ও ঘুষখোর হয়, তাহলে দেশের ধ্বংসের পক্ষে তাদের চেয়ে আর কোন বস্তুই অধিকতর ক্ষতিকর হতে পারে না। কিন্তু এতেও সন্দেহ নেই যে, গোটা সাম্রাজ্যের টুকরো টুকরো সংবাদ অবগত হবার যদি কোন উপায় থাকে তবে সেটা এই। এর কারণ ছিল, খলিফা ও সুলতানগণ,—যথা, হজরত উমর ফারুক, মামুনুর রশীদ, নাসিরুদ্দিনিল্লাহ প্রমুখ যাঁরা ন্যায়বিচারের প্রতীক ছিলেন, তাঁরা সকলেই এই বিভাগ স্থাপন করেছিলেন এবং এর যথেষ্ট বিস্তার সাধন করেছিলেন। অবশ্য এ বিভাগের কার্যকলাপ সম্পর্কে তাঁরা খুব সাবধানতা অবলম্বন করতেন। আলমগীরও এই সতর্কতা অবলম্বনের ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন এবং এর বিপত্তি সম্বন্ধেও অবহিত ছিলেন। কোন এক ঘটনা উপলক্ষে তিনি এক পত্রে লিখেছেন :

"যেহেতু, জীবনী লেখকেরা স্বার্থপ্রণোদিত হয়ে দাসদের ঘাড়ে দোষসমূহ চাপিয়ে দিয়ে রিপোর্ট লিখে থাকেন, আশা করি আপনি দীওয়ানে লিখে রাখবেন যেন সমস্ত পদগুলি সম্পর্কেই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সন্ধান নেয়া হয় এবং রাজধানীতে সে সম্পর্কে রিপোর্ট প্রেরণ করা হয়।"

ময়েজ উদ্দিন তাঁর পৌত্রকে একখানা পত্রে একজন সম্পর্কে লিখেছেন :

"যদি প্রয়োজন মনে কর, তাহলে রিপোর্টারের কাজ অন্য কাকেও প্রদান করতে পার। কারণ, আজকালকার রিপোর্টারেরা সত্যিকার রিপোর্টার নন।"

তিনি আজম শাহকে এক পত্রে লিখেছেন :

"তিনি রিপোর্ট'রে, কার্যকারক ও বিশেষজ্ঞদেরকে মহলে স্থান দান করতেন এবং রোজ রোজ তাঁদের কার্যাবলীর রিপোর্ট চেয়ে পাঠাতেন।"

রিপোর্ট'রের প্রথা চালু করার কল্যাণেই হিন্দুস্তানের মত এই বিরাট সাম্রাজ্যের প্রতি প্রান্তের খবর আলমগীরের নিকট পৌঁছে যেত। তাঁর রাজত্ব-কালের এটা একটা বৈশিষ্ট্য যে, তিনি তাঁর প্রজাবৃন্দের প্রকৃত অবস্থার যতদূর খবর রাখতেন এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করতেন, অন্য যে-কোন রাজত্বকালেই এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। তাঁর পত্রাবলী পাঠ করুন,—দেখতে পাবেন তিনি শাহজাদা, সুবাদার এবং আলেমদের প্রত্যেকটা দোষ খুঁজে বের করেন এবং তাতে সংবাদদাতার প্রসঙ্গ প্রদান করেন। সহস্র ক্রোশ দূরেও যদি কোন সওদাগর বা পথিকের কোন জিনিস হারিয়ে যায়, তৎক্ষণাৎ তিনি সে সংবাদ প্রাপ্ত হন এবং সেখানকার শাসনকর্তার নিকট তার সন্ধান জিজ্ঞাসা করেন।

আলমগীরের রাজত্বের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর বিষয় হচ্ছে ক্ষুদ্র-বৃহৎ সমস্ত ব্যাপারে সমানভাবে অবহিত থাকা। একদিকে যেমন তিনি বিরাট বিরাট অভিযান নিয়ে বিরত থাকতেন—এমনকি নিশ্বাস ফেলবার অবসরও ছিল না, অন্যদিকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়টিও তাঁর দৃষ্টি এড়াতে পারতনা,—সেগুলোকেও তিনি একই মনোযোগ ও দৃষ্টিসহকারে সম্পন্ন করতে পারতেন। এলফিনিস্টন সাহেব অপেক্ষা আলমগীরের বড় শত্রু দ্বিতীয় আর কেউ ছিলেন না। কিন্তু তিনিও লিখতে বাধ্য হয়েছেন :

"তিনি একাকীই তাঁর রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি বিভাগের কার্যকলাপ স্বয়ং দেখে নিতেন। সৈন্য পরিচালনা করার মানচিত্র নিজেই প্রস্তুত করতেন। সৈন্য চালনা করবার সময় জরুরী পরামর্শ প্রদান করতেন। সেনানায়ক দুর্গের মানচিত্রগুলো এই উদ্দেশ্যে তাঁর খেদমতে পেশ করা হত যেন আক্রমণের লক্ষ্যস্থলগুলো তিনি নির্ধারণ করেন। তাঁর পত্রাবলীর ভিতরে পাঠানদের সমতলভূমিতে সড়ক নির্মাণ করা, মুলতান ও আগ্রার গণ্ডগোল দমন করা, বরং কান্দাহার পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা-তদবিরও দেখতে পাওয়া যায়। এই সময়ে সৈন্যবাহিনীর এমন কোন দল অথবা যানবাহনের এমন কোন অংশ ছিল না, যাদের স্থান ত্যাগ করার নির্দেশ অবিকল আওরঙ্গজেব

স্বহস্তে প্রদান না করেছিলেন। কোন জেলার খাজনা আদায়ের একজন নগণ্য অফিসারের নিযুক্তি অথবা কোন বিভাগের কোন মহরীর নির্বাচন ব্যাপারেও দৃষ্টিপাত না করা তিনি সঙ্গত বোধ করেননি। এছাড়া গুপ্তচর ও পথচারীদের সাহায্যে তিনি কর্মচারীদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করতেন। এইভাবে সংগৃহীত সংবাদাদির সত্যতাকে ভিত্তি করে উপদেশ ও নির্দেশাদির দ্বারা তাদেরকে সর্বদাই সতর্ক রাখতেন। তথাপি খুঁটিনাটি সমস্ত কার্যের প্রতি বিস্তারিতভাবে এমন উৎসাহের সঙ্গে নিমগ্ন থাকা, সতর্কতা ও সদা-সচেতনতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হলেও কার্যসমূহের প্রকৃতি ও উন্নতি এবং কার্য পরিচালনার যথাবিহিত উৎকর্ষ সাধনকল্পে ততখানি ফলদায়ক বিবেচিত হয় না। কিন্তু আওরঙ্গজেবের স্বভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্যের প্রতি দৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠতম গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীতেও দক্ষতা ও নিপুণতা পরিলক্ষিত হয়। এতে তাঁর স্বাভাবিক মনোযোগ ও উদ্দীপনার এমন পরিচয় পাওয়া যায় যা সর্বকালেই অত্যন্ত বিস্ময়কর ও অতুলনীয় বিবেচিত হয়ে থাকে। (এলফিনিস্টন সাহেবের ইতিহাসের অনুবাদ, পৃঃ ১১৯ ও ১২)।

এশীয় রাষ্ট্রগুলো চিরদিনই এ দুর্ণাম বহন করে চলেছে যে, কর্মচারী ও অফিসারগণের অধিকাংশই ঘুষখোর। এই ঘুষ খাওয়ার কারণগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুতর ছিল উপঢৌকন ও নজরানা প্রথা। অর্থাৎ সমস্ত উজীর, আমীর ও কর্মচারীরা মিলিতভাবে বার্ষিক মিলনোৎসবে বাদশাহ্‌কে অত্যন্ত মূল্যবান নজরানা পেশ করতেন। যার মূল্য ঐ সকল কর্মচারীর এক বৎসরের বেতনের প্রায় সমান অঙ্কে দাঁড়াত। অতএব তাদেরকে এর ক্ষতিপূরণের জন্য ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হোক প্রজাবৃন্দের নিকট থেকে অসদুপায় অবলম্বন করে অর্থ গ্রহণ করতে হ'ত। জাহাঙ্গীর তাঁর ডায়রীতে এই সকল নজরানার কাহিনী অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন এবং প্রত্যেকটি জিনিসের বিস্তৃত বিবরণী প্রদান করেছেন। কতকগুলো নজরানার সংখ্যা কোটির অধিক হয়ে পড়ত। যদিও বাদশাহ্ নিজেও এর বিনিময়ে অসংখ্য পুরস্কার বিতরণ করতেন, কিন্তু তবু এটা বলা মুশকিল, ঐ পুরস্কারগুলো উক্ত নজরানাসমূহের সম-বিনিময় হত কিনা। তাছাড়া পুরস্কারাদি স্বভাবতই টাকা-পয়সার আকারে দেওয়া হয়নি। অথচ নজরানাস্বরূপ যে সমস্ত দ্রব্য নিবেদন করা হত তা অর্থের

বিনিময়েই ক্রয় করতে হত। যাহোক, এটা নিশ্চিত যে, এটা একটা অত্যন্ত নিন্দনীয় প্রথা ছিল এবং শত শত বিপত্তি এর ফলে সৃষ্টি হত। আলমগীর এই প্রথাটার মূলোচ্ছেদ করে দিলেন। এর বিস্তৃত বর্ণনা সামনে দেওয়া হচ্ছে।

বিচার-আচার

আলমগীরের রাজত্বকালের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে তাঁর ন্যায়-পরায়ণতা ও সুবিচার। তাঁর বিচার ব্যবস্থায় আত্মীয়-অনাত্মীয়, ধনী-গরীব এবং শত্রু-মিত্রের কোন ভেদাভেদ ছিল না। একখানা পত্রে তিনি স্বয়ং লিখেছেন :

"বিচার ক্ষেত্রে শাহজাদাদেরকেও আমি সাধারণ লোকের পর্যায়ভুক্ত মনে করি।"

এটা শুধু একটা মৌখিক দাবী নয় বরং প্রতিপক্ষ দলও এর সত্যতা স্বীকার করেছেন। লেনপুল সাহেব আলমগীরের জীবনী গ্রন্থে লিখেছেন :

লেনপুল সাহেব বলেন, (তাঁর নিজস্ব রচনা তেমন বিশ্বাসযোগ্য নয় ; কিন্তু তাঁর অভিমত এমন সমস্ত সমালোচকদের লিখিত মন্তব্য থেকে গ্রহণ করেছেন আওরঙ্গজেবের প্রতি যাঁদের সামান্য অনুভূতিও ছিল না—তাঁরা বোম্বাই ও সুরাটের ব্যবসায়ী ছিলেন), "মুঘল বংশের এই বাদশাহে আজম ন্যায়-বিচারেও দরিয়ায়ে আজম ছিলেন। ভেবে-চিন্তে ও পরীক্ষা করে তিনি রায় স্থির করতেন। তাঁর দরবারে শুধু আমীরি ও মনসবগীরির সুপারিশ করা হত না, বরং নগণ্যতম ব্যাক্তির বিবৃতিও তিনি একজন উচ্চপদস্থ অফিসারের বিবৃতির মতই মনোযোগ দিয়ে শুনতেন।"

ডাঃ কারিরীও, যিনি দাক্ষিণাত্যে ১৬৯৫ খ্রীস্টাব্দে আওরঙ্গজেবের দর্শন লাভ করেছিলেন, তিনিও বাদশাহর চালচলন সম্পর্কে উল্লিখিত রূপ বর্ণনা প্রদান করেছেন। (লেনপুলের অনুবাদ, পৃঃ ৭৬—৭৭)।

লেনপুল সাহেব আর এক স্থানে লিখেছেন :

"আওরঙ্গজেবের চালচলনের উপর পরিব্রাজকদের বিরুদ্ধ-সমালোচনা ঐ সময় পর্যন্তই ছিল, যে পর্যন্ত তিনি শাহজাদা মাত্র ছিলেন। কিন্তু সেই পরিব্রাজকই যখন তাঁর সম্রাট হওয়ার পরবর্তী ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন তখন তাঁর প্রশংসা-কীর্তন ব্যতীত আর কিছুই লেখেননি। তাঁর সুদীর্ঘ

৫০ বৎসর রাজত্বকালের ইতিহাসে অত্যাচারমূলক একটা কাজও তাঁর বিরুদ্ধে প্রমাণিত হয়নি। এমনকি হিন্দুদের দমন কাজেও, যা তাঁর ধর্মীয় কর্তব্যের অঙ্গ ছিল, সেক্ষেত্রেও সকলকেই স্বীকার করতে হয়েছে, কোন হত্যা বা শারীরিক নিপীড়ন তাঁর দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়নি।" (লেনপুলের অনুবাদ, পৃঃ ৫৭)।

আলমগীর রাষ্ট্রের গৌরব, শানশওকাত ও সুখ-স্বাচ্ছন্দের পরিবর্তে কেবল প্রজাবৃন্দের খেদমত এবং তাদের আরাম প্রদান করাই আপন জীবনের উদ্দেশ্য বলে স্থির করেছিলেন। তিনি তাঁর বার্ধক্যের শেষ পর্যন্ত দরবারে দাঁড়িয়ে প্রজাদের দরখাস্ত স্বহস্তে গ্রহণ করতেন এবং স্বয়ং তার উপর আদেশ লিখতেন।

ডাঃ জেলী-কারেরী আলমগীরকে তাঁর ৭৮ বৎসর বয়সে দেখেছিলেন। তিনি যে বর্ণনা দিয়েছেন তা নিম্নরূপ :

"তিনি পরিষ্কার সাদা ধবধবে মলমলের পোশাক পরে বার্ধক্যের যষ্টি হাতে করে আমীরদের দলে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর উষ্ণীষে জমরুদের একটা বড় টুকরা জ্বল জ্বল করছিল। তিনি বিচারপ্রার্থীদের দরখাস্তগুলো গ্রহণ করলেন এবং চশমা ব্যতিরেকেই তা' পাঠ করে স্বহস্তে দস্তখত করতে লাগলেন। তাঁর সৌম্য ও প্রসন্নমূর্তিতে স্বতঃতই প্রতীয়মান হ'ত যে, তিনি তাঁর কর্মব্যস্ততার জন্য অত্যন্ত আনন্দবোধ করতেন।" (এলফিনিস্টন সাহেবের ইতিহাসের অনুবাদ, আলীগড়ী ছাপা, পৃঃ ১৩৩)।

তিনি দিনে দুই-তিনবার আম-দরবার করতেন, কারও জন্য আদৌ কোন বাধা-নিষেধ ছিল না। নগণ্যতম ব্যক্তিও সম্রাট সমীপে তার বক্তব্য পেশ করতে পারত। আলমগীর অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে তা শ্রবণ করতেন। মির্জা কামবখ্‌শ্‌ আলমগীরের অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ পুত্র ছিলেন। তাঁর দুগ্ধ-ভ্রাতার বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আরোপিত হয়। আলমগীর আদেশ দিলেন যে, বিচারালয়ে এর তথ্যানুসন্ধান করা হোক। (মাসেরে আলমগীরি, পৃঃ ৫২৭)। কামবখ্‌শ্‌ তার (দুগ্ধভ্রাতার) পক্ষে দাঁড়ালেন। আলমগীর কামবখ্‌শ্‌কে দরবারে ডেকে পাঠালেন। কামবখ্‌শ্‌ ভ্রাতাকেও সঙ্গে নিয়ে এলেন এবং কিছুতেই তাকে দূরে সরিয়ে রাখলেন না। আলমগীর কামবখ্‌শ্‌কেও তার দুগ্ধভ্রাতার সঙ্গে বন্দী করতে হুকুম দিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সে হুকুম প্রতিপালিত হ'ল।

আলমগীর তঁার সিংহাসনারোহণের সপ্তদশ বর্ষে মোতাবেক ১০৮৫ হিজরীতে হাসান আবদালের সফরে একদিন এক বাগানে অবস্থান করেছিলেন। তার দেওয়ালের পেছনে এক বৃদ্ধার গৃহ ছিল। বৃদ্ধার একটা মিল (পান-চাক্কী) ছিল। তাতে ঐ বাগান থেকে পানি আসত। সরকারী লোকেরা পানি বন্ধ করে দিলেন। ফলে মিল বন্ধ হয়ে গেল। খবর পেয়ে আলমগীর সঙ্গে সঙ্গে পানি খুলে দেবার হুকুম দিলেন। রাত্রে যখন আহার করতে বসলেন তখন ২টা বড চীনা ডিশ আহারের কাজে ব্যবহার করার জন্য ও ৫টা আশরফী আবুল খয়েরের হস্তে বৃদ্ধার নিকট প্রেরণ করলেন এবং তঁার পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বললেন। কারণ দুঃখের বিষয় তাঁর আগমন-বশতঃই বৃদ্ধা কষ্টে পতিত হয়েছিল। সে যেন ক্ষমা করে দেয়। ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাল্‌কী পাঠিয়ে দিয়ে তিনি বৃদ্ধাকে নিয়ে এলেন এবং অন্দরমহলে পাঠিয়ে দিলেন। খবর নিয়ে জানা গেল যে, বৃদ্ধার ২টা অবিবাহিতা কন্যা ও ২টা শিশু আছে। আলমগীর তাকে দুইশত টাকা দান করলেন। বেগমগণ তাকে প্রচুর ধনরত্নাদি দ্বারা খুশী করে দিলেন। দুই-তিন দিন পর পুনরায় ডেকে পাঠালেন এবং কন্যা সম্প্রদান উপলক্ষে দুই হাজার টাকা দান করলেন। তদুপরি বেগমগণ ও শাহ্‌জাদাগণ টাকা ও আশরফীর বৃষ্টি বর্ষণ করলেন। এমনকি অল্পদিনের মধ্যেই বৃদ্ধা বিরাট ধনী হয়ে গেল। (মাসেরে আলমগীরি, পৃঃ ১৩২, ১৩৩ ও ১৩৪)।

দর্শন প্রথাকে তিনি কঠোরহস্তে রহিত করেছিলেন। কিন্তু কোন বিচার-প্রার্থী আগমন করলে তার দরখাস্ত রশিতে বেঁধে উপরে পৌঁছিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। (মাসেরে আলমগীরি, পৃঃ ৯৫)।

ইত্যাকার শত শত ঘটনা পড়ে রয়েছে। একটা প্রবন্ধের মধ্যে ঐ সমস্ত ঘটনা সন্নিবেশিত করা সম্ভবপর নয়। আলমগীরের পত্রাবলী পাঠ করুন। তার ছত্রে ছত্রে দেখতে পাবেন যে, বিচার প্রদানকল্পে কিরূপ তাকিদ, কিরূপ গুরুত্ব ও কিরূপ সহানুভূতির সঙ্গে আদেশসমূহ ও নির্দেশাবলী প্রেরণ করতেন। তাঁর আন্তরিক কামনা ছিল, একটি লোকেরও যেন একটা লোম পর্যন্ত কেউ স্পর্শ করতে না পারে।

বাদশাহ্‌পরস্তির বিলোপ সাধন

তৈমুরী বাদশাহ্‌রা যদিও প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁদের একচ্ছত্র আধিপত্যের ভিতর দিয়েও সাম্রাজ্য পরিচালনায় শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট শাসনকার্যের পরিচয় দিয়েছিলেন, কিন্তু তবু শাসন ব্যবস্থা সর্বতোভাবে শাহ্‌পরস্তির মধ্যেই নিহিত ছিল। প্রজাদের বিশ্বাস মতে বাদশাহ্ একটা অলৌকিক শক্তি এবং তিনি খোদার ছায়া নন, বরং তাঁর বহিঃপ্রকাশ ছিলেন। আকবরের দর্শন লাভ এবাদত বলে গণ্য করা হত এবং প্রত্যহ সকালবেলা একটা বিরাট দল এই উপাসনা পালন করত। প্রকাশ্য দরবারে বাদশাহ্‌কে সেজদা করা হত। শাজাহান এই সেজদা প্রথা রহিত করেছিলেন ; কিন্তু তার পরিবর্তে ভূমি-চুম্বন রীতি প্রবর্তন করেছিলেন যা সেজদারই নামান্তর।

বাদশাহ্‌র বাহ্যাড়ম্বরের ব্যাপারে তাঁর পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং ভ্রমণাদি উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ কেন কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হত এবং এইরূপ ধারণা করা হত যে, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ হাকিমের জন্য এটা ন্যায্য অধিকার। বাদশাহ্‌র খেদমতে কোন ব্যক্তি তাঁর বন্দনা জ্ঞাপন ব্যতীত আবেদন-নিবেদন জানাতে পারত না। মোটকথা, আসমানের উপরে কোন খোদা থাকে তো থাক, কিন্তু দুনিয়ার খোদা তো এই বাদশাহ্ নামদারই বটে। এর কারণ ছিল, তৈমুর বলতেন, আসমানের উপর যেমন খোদা একজন, তেমনই পৃথিবীতেও একজনই হওয়া উচিত। এটা নিশ্চয়ই ইসলামের মূল-নীতির একান্তই ব্যতিক্রম ছিল। ইসলাম ভ্রাতৃত্ব বা সাম্যবাদ নীতির প্রবর্তন করেছিল, যার ভিত্তিতে রাজা ও প্রজা, ধনী ও নির্ধন, কুলীন ও অকুলীন সকলকে একই আসনে সমাসীন করানো হয়েছিল।

যে প্রথা তৈমুরের সময় থেকে শাজাহানের রাজত্বকাল পর্যন্ত দিন দিন প্রসারলাভ করেই চলেছিল, আলমগীর তার আমূল পরিবর্তন সাধন করতে পারেননি। কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন যাতে রাষ্ট্রের মুখমণ্ডল থেকে খোদায়ী মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্বের রং ও বর্ণ অপসারিত না হয়ে যায়।

দর্শন প্রথা রহিতকরণ

১০৭৯ হিজরী সালে দর্শন প্রথা অর্থাৎ এবাদত মনে করে সকালবেলা বাদশাহ্‌র পবিত্র মূর্তি দর্শন লাভের আশায় আগমন করা এবং যতক্ষণ তা

না ঘটে ততক্ষণ আহার গ্রহণ না করা আলমগীর একদম বন্ধ করে দিলেন। (খাফী খাঁ, পৃঃ ৩১৩, 'হালাতে আলমগীরি')।

সভা-কবিদের সংখ্যা হ্রাসকরণ

দরবারে অনেক কবি নিযুক্ত ছিলেন। তাঁরা বাদশাহ্‌র স্তুতিগান লিখে আনতেন এবং তাঁকে খোদার সমকক্ষ বলতেন। তাঁদের মোটা মোটা বেতন দেওয়া হত। এঁদের মধ্যে একজন দলপতি থাকতেন, তাঁকে কবি-সম্রাট বলা হত। ঐ বছরেই তিনি এই বিভাগটাকে একদম লোপ করে দিলেন। (খাফী খাঁ দ্রষ্টব্য)।

নজরানা বন্ধ করা

নওরোজের উৎসব উপলক্ষে সমস্ত আমীরেরা বাদশার খেদমতে মহামূল্যবান উপঢৌকনাদি নিবেদন করতেন। কতকগুলো উপঢৌকনের সংখ্যা কোটি অতিক্রম করে যেত। জাহাঙ্গীর এই নজরানা সম্পর্কে পরম আগ্রহে বিস্তারিত বিবরণী লিপিবদ্ধ করেছেন। আলমগীর তাঁর ২১তম অভিষেক বর্ষে মোতাবেক ১০৮৮ হিজরীতে এই প্রথা বন্ধ করে দিলেন। 'মাসেরে আলমগীরি', ১৬২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে :

"বখশী-উল-মুল্‌ক্ ছফি খাঁকে আদেশ দেওয়া যাচ্ছে যে, উৎসব বন্ধ করে দেওয়া হোক, আমীরুল উমারার উপঢৌকন ফেরৎ দেওয়া হোক এবং অন্যান্য কর আদায়ও বন্ধ করা হোক।"

বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ কাজগুলি রহিতকরণ

দরবারে যত রকম আড়ম্বর ও সাজসজ্জা করা হত তা সবই তিনি বন্ধ করে দিলেন। এমনকি রৌপ্যনির্মিত দোয়াতের স্থলে চীনা দোয়াত ব্যবহারের নির্দেশ দিলেন। উপঢৌকনের দ্রব্যাদি রৌপ্যনির্মিত রেকাবিতে করে আনা হত। তার পরিবর্তে তিনি ঢালে করে আনবার ব্যবস্থা করলেন। (খাফী খাঁ দ্রষ্টব্য)। জরবাফ্‌ত ইত্যাদির খেলাত বন্ধ করে দিলেন।

একে অপরকে সালাম প্রদান শাহী দরবারের সৌজন্যের ব্যতিক্রম বলে বিবেচিত হত। এর জন্য শুধু মস্তকে হস্ত স্থাপন করাই যথেষ্ট ছিল। ১০৮০

সালে তিনি আদেশ দিলেন, এই প্রথার পরিবর্তে লোকে স্বাভাবিক নিয়মে 'সালাম আলায়কুম' বলবে। (মাসেরে আলমগীরি, পৃঃ ১৬২)।

আলমগীর বিভিন্ন অবস্থার ভিতর দিয়ে তাঁর নিজস্ব কার্যপদ্ধতির দ্বারা বুঝিয়ে দিলেন যে, বাদশাহ নিজে একজন সাধারণ লোক ব্যতীত কিছুই নন। তাঁরও অধিকার সাধারণের অধিকারের উর্ধ্বে নয়। ষষ্ঠদশ অভিষেক বর্ষে তথা ১০৮৩ হিজরী সালে তিনি বকরাঈদের নামাজ পড়তে যাচ্ছিলেন। ফিরবার পথে এক ব্যক্তি তাঁকে একখণ্ড কাঠ ছুঁড়ে মারল। ঐ কাঠখণ্ড আলমগীরের জানুতে আঘাত করল। গুর্জবর্দার তাকে ধরে ফেলল। আলমগীর বললেন, 'ছেড়ে দাও।' (মাসেরে আলমগীরি)।

ত্রিশতম অভিষেক বর্ষে একদিন যখন তিনি জামে মসজিদ থেকে ফিরছিলেন, তখন এক ব্যক্তি তরবারি উত্তোলন করে তাঁর দিকে ধাবিত হল। লোকে তাকে ঘিরে ফেলল এবং হত্যা করতে উদ্যত হল। আলমগীর বাধা দিলেন এবং তার জন্য দৈনিক আট আনা ভাতা ধার্য করলেন। (মাসেরে আলমগীরি।) এরূপ ঘটনা যদি আর কোন বাদশাহর বেলায় ঘটত তাহলে অপরাধীকে টুকরা টুকরা করে ফেলা হত।

বাদশার পকেট খরচের ব্যয় কমানো

পূর্ববর্তী বাদশাহদের রাজত্বকালে তাঁদের পকেট খরচ বাবদ কোটি কোটি টাকা আয়ের কতকগুলি মহল নির্ধারিত ছিল। সেখান থেকে তাঁদের খরচের টাকা সংগৃহীত হত। কিন্তু আলমগীর উক্ত ব্যয়নির্বাহ হেতু মাত্র কতিপয় গ্রাম ও লবণখনি রেখে অবশিষ্ট এলাকাকে বায়তুল মালের জন্য ধার্য করেছিলেন। (মাসেরে আলমগীরি, পৃঃ ৯২৫)।

তাঁর জীবন যাপন নিতান্ত সাদাসিদে ও তপস্বী ধরনের ছিল। টুনিয়ার সাহেব তাঁকে ১৬৬৫ খ্রীস্টাব্দে দেখেছিলেন। তিনি লিখেছেন :

"তিনি খুব জীর্ণশীর্ণ ও ক্ষীণকায় হয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁর রোজা পালন তাঁর ক্ষীণতা আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল।"

লেনপুল লিখেছেন :

"আওরঙ্গজেব তাঁর অবসর মুহূর্তে টুপী তৈরী করতেন।"

টুপী তৈরী করা সত্য হোক আর নাই হোক কিন্তু এটা সুনিশ্চিত যে, আলমগীর স্বহস্ত অর্জিত অর্থেই জীবিকা নির্বাহ করতেন। ইত্যাকার ব্যবস্থা অবশ্য ঐ সমস্ত প্রথা ও কার্যকলাপের বিলোপ সাধনকল্পে ছিল, যাতে করে বাদশাহ্কে যেন খোদার কাছাকাছিই বলে কেউ গণ্য না করে।

শিক্ষা-দীক্ষার উন্নতি

আলমগীর পঠন-পাঠন ও অধ্যাপনার যে উন্নতি বিধান করেছিলেন, হিন্দুস্তানে অন্য কোন বাদশাহ্র আমলেই আর তা হয়নি। প্রত্যেক শহর ও পল্লীতে আলেম-ফাজেলদের জন্য ভাতা ও বৃত্তি নির্ধারিত ছিল। তার ফলে তাঁরা নিশ্চিন্ত মনে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কাজে নিমগ্ন থাকতেন। তাছাড়া প্রত্যেক স্থানেই ছাত্রদের জন্যও বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। মাসেরে আলমগীরিতে লিখিত আছে :

"এই বিরাট সাম্রাজ্যের শহরে ও পল্লীতে পণ্ডিতমণ্ডলী ও শিক্ষকদেরকে উপযুক্ত ভাতা ও সম্পত্তি দ্বারা নিয়মিত বৃত্তি প্রদান করা হত। ছাত্রদের জন্যও তাদের জীবিকা মোতাবেক এবং মেধানুসারে স্টাইপেণ্ড দেওয়া হত।" (পৃঃ ৫২৯)।

বেনারসে প্রদর্শিত নদওয়াতুল ওলামার শিক্ষা প্রদর্শনীতে আমি তৈমুরী বংশের সুলতানদের রাজত্বকালীন বহুসংখ্যক ফরমান সংগ্রহ করেছিলাম। তন্মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশের অধিক আলমগীরের ফরমান ছিল। এই সমস্ত ফরমানগুলোই কোন না কোন আলেম বা দরবেশের জায়গীর অথবা তাঁদের জীবিকা নির্বাহের সাহায্যস্বরূপ লিখিত ছিল। বিদ্বজ্জনদের বৃত্তিদানমূলক যে সকল ফরমান আমার হাতে এসেছিল তার প্রায় সমস্তই আলমগীরের দরবার থেকে প্রকাশিত।

তিনি সমগ্র দেশব্যাপী সরাইখানা, কাফেলা সরাই এবং মুসাফিরখানা নির্মাণ করেছিলেন। অধিকাংশ জেলাগুলোতেই তিনি খাদ্যভাণ্ডার স্থাপন করেছিলেন। দুর্ভিক্ষের সময় সেখান থেকে দীন-দুঃখীদের বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ করা হ'ত।

ধর্মীয় পরিস্থিতি

আলমগীর যদিও খেলাফতের দাবীদার ছিলেন না, তবু তিনি একজন মুসলমান ছিলেন। সুতরাং তাঁর কর্তব্য ছিল, তিনি শাসনকার্যে এতখানি ইসলামী মান বজায় রাখেন, যতখানি একটা ইসলামী রাষ্ট্রের মূলনীতিগত প্রশ্নের দিক দিয়ে দরকার। আকবর এই রাষ্ট্রকে যে রঙে রঞ্জিন করে তুলেছিলেন এবং যার চিহ্ন শাজাহানের রাজত্বকাল পর্যন্ত অবশিষ্ট ছিল, যদি তাই চলতে থাকত তাহলে তৈমুরী রাষ্ট্র আস্ত একটা হিন্দু রাষ্ট্রেই পরিণত হয়ে যেত। ইসলামী সভ্যতা একদম লোপ পেয়ে বসেছিল। আম-দরবারের পোশাক ঘেরা পায়জামা এবং হিন্দুয়ানী পাগড়ি ছিল। রাজাদের ন্যায় বাদশাহরাও গহনা পরিধান করতেন। দরবারে সালামের পরিবর্তে সেজদা ও মাথায় টিকি রাখার প্রথা চালু ছিল। এই নির্লজ্জতা এত নিম্নস্তরে নেমে গিয়েছিল যে, নির্লজ্জ মুসলমানেরা হিন্দুদের হাতে কন্যা সম্প্রদান করতে আরম্ভ করেছিল। যার ইতিবৃত্ত আমি ইতিপূর্বেই বিবৃত করেছি।

সাল পরিবর্তন

আলমগীর যখন সাম্রাজ্যের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করলেন তখন তাঁর কর্তব্য হয়ে পড়ল ইসলামী সভ্যতা পুনরুজ্জীবিত করা। তিনি সর্বপ্রথম ১০৬৯ হিজরী সনে অর্থাৎ তাঁর ঐতিহাসিক রাজ্যাভিষেকের এক বৎসর পরেই সৌর সালকে, যা পারসিকদের অনুকরণ ছিল, চান্দ্র সালে পরিবর্তন করে ফেললেন। যদিও এটা বাহ্যতঃ একটা সামান্য বিষয়, কিন্তু এই ধরনের সাধারণ বিষয়গুলোই পৃথিবীতে বহু জাতির উত্থান ও পতন ঘটিয়ে দিয়েছে।

দর্শন প্রথা

দর্শন প্রথা সম্পূর্ণ ইসলাম-বিরোধী ছিল। ইসলামের সর্বাপেক্ষা প্রশংসনীয় বিষয় এই যে, ইসলাম সর্বদাই মানুষকে মানুষের পর্যায়েই কায়েম রেখেছে। কখনও কোন মানুষকে পূজা করবার বা উপাসনা করবার অনুমতি প্রদান করেনি। কিন্তু দর্শন প্রথা যথার্থই এক প্রকার উপাসনা ছিল। সুতরাং আলমগীর ১০৭৯ হিজরী সনে এই প্রথা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিলেন।

সালাম আলায়কা প্রথা

১০৮২ হিজরী সনে আলমগীর ছালাম মসনুন প্রথার প্রবর্তন করলেন এবং হুকুম প্রদান করলেন যে, মুসলমান মাত্রেই সাধারণভাবে পরস্পর মেলা-মেশা করবার সময় এই নিয়ম পালন করবে।

গান-বাদ্য বন্ধ

গান-বাদ্যও শাহী দরবারের কার্যসূচীর একটা প্রয়োজনীয় বস্তু হয়ে পড়েছিল। প্রত্যেক দিন একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শাহী দরবার নৃত্যগীতের একটা উৎসবস্থলে পরিণত হত। আলমগীর যদিও ('মাসেরে আলমগীরির' বিস্তারিত বর্ণনা মতে) গীতিবিদ্যায় পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু যেহেতু বাদ্যসহকারে গান করা শরীয়তে নিষিদ্ধ এবং শাহী দরবারের পক্ষেও মর্যাদা হানিকর, তাই তিনি এই বিভাগটির সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন করলেন। গায়কের দল তখন এই উপলক্ষে একটা কৃত্রিম জানাজা বের করলেন। আলমগীর তা দেখে মন্তব্য করলেন, "হাঁ ওর সমাধি এমনভাবে রচনা কর যাতে আর কোন দিন মাটি ফেঁড়ে বেরিয়ে আসতে না পারে।"

ইহ্‌তেছাব

এর জন্য একটা স্বতন্ত্র বিভাগ খুলে দিলেন এবং জেলায় জেলায় এর জন্য মোহতাছেব নিয়োগ করলেন। তাঁদের কর্তব্য ছিল জনসাধারণকে সমস্ত নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত রাখা। এই বিভাগের কর্তা ছিলেন মোল্লা অজিহুদ্দিন।

মসজিদের বিধি-ব্যবস্থা

সমগ্র দেশে যতগুলি মসজিদ ছিল প্রত্যেকটার জন্যই তিনি ইমাম, মুয়াজ্জেন ও খতীব নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁদের বেতন সরকার থেকে দেওয়া হত। (মাসেরে আলমগীরি, পৃঃ ৫২৯)।

ফাতাওয়ায়ে আলমগীরি

যেহেতু শরায়ী সমস্যাসমূহের সমাধানকল্পে প্রয়োজনীয় মসয়ালা সম্বলিত কোন ফেকাহ্ গ্রন্থ মৌজুদ ছিল না, যা থেকে যে-কোন ব্যক্তি সহজেই যে-কোন মসয়ালা সংগ্রহ করতে পারে। সুতরাং এই উদ্দেশ্যে আলমগীর সমস্ত

আলেম-ফাজেলদের একত্রিত করে গ্রন্থাদি রচনা করবার জন্য একটা স্বতন্ত্র বিভাগ খুলে দিলেন। এর অধ্যক্ষ ছিলেন মোল্লা নেজাম। এই কার্যোপলক্ষে শাহী কুতুবখানা—যাতে অসংখ্য কেতাব সংরক্ষিত ছিল, তিনি তা ওয়াক্ফ করে দিলেন। কতিপয় বৎসরের অবিরাম চেষ্টার ফলে উক্ত গ্রন্থখানা বিরচিত হল। যা আজ 'ফতোয়ায়ে আলমগীরি' নামে পরিচিত। আরব ও রোমে একে 'ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া' বলা হয়। যদিও ঐ কাজে নিযুক্ত ওলামাদের বেতন এমন বেশী কিছু ছিল না, তথাপি দুই লক্ষ টাকা ব্যয় হয়ে গিয়েছে। 'মাসেরুল উমারা' গ্রন্থে আমি কারও দৈনিক ভাতা ৩'০০ টাকার অধিক দেখিনি। এই গ্রন্থের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, যে সমস্ত মসয়ালা অন্যান্য ফেকাহ্ গ্রন্থে জটিল ভাষায় লিখিত রয়েছে সেগুলো এত সহজবোধ্য করে দেওয়া হয়েছে যে, একটা শিশুর পক্ষেও বুঝতে কষ্ট হয় না।

দীনিয়াত শিক্ষা

ফেকাহ্ ও হাদিস শাস্ত্রের শিক্ষা তিনি যথারীতি চালু করলেন। প্রত্যেকটি জনপদে ধর্মশাস্ত্রের আলেমগণ উক্ত শাস্ত্রের অধ্যাপনা করতেন। সেজন্য তাঁদেরকে সরকার থেকে বেতন প্রদান করা হত।

তিনি নিজেও ধর্মীয় বিধিনিষেধ মেনে চলতেন। সর্বদাই অজুর সঙ্গে থাকতেন। সর্বদাই জামায়াতের সঙ্গে নামাজ পড়তেন। সপ্তাহে ৩ দিন রোজা রাখতেন। আমোদ-প্রমোদের সভায় কোনদিন যোগ দেননি। মাসেরে আলামগীরির পরিশিষ্ট)।

আশ্চর্যের বিষয়, এহেন দ্বীনদারী ও ধর্মানুরাগ সত্ত্বেও তিনি জাহের-পরস্ত ও সরলবিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর দ্বীনদারী দর্শনে মক্কার শরীফ কয়েকবার তাঁর নিকট দূত প্রেরণ করেন। এই উপলক্ষে আলমগীর একখানা পত্রে লিখেছেন :

"মক্কা মোয়াজ্জমার শরীফ সাহেব হিন্দুস্তানের বেশুমার ধন-দৌলতের কাহিনী শ্রবণ করে আপন স্বার্থের আশায় প্রত্যেক বৎসর দূত প্রেরণ করেন। কিন্তু আমি যে টাকাগুলো প্রেরণ করি তা শুধু দীন-দুঃখীদের উদ্দেশ্যে। সুতরাং এ ব্যাপারে চিন্তা করে দেখা উচিত যে, ঐ টাকাটা যেন ঐ গরীবদের হস্তগত হয় এবং ঐ খেয়ানতকারীর (মক্কার শরীফ) হস্তে যেন পতিত না হয়।"

নিজস্ব গুণাবলী ঃ শৌর্যবীর্য ও বীরত্ব

তৈমুরের রক্তে সর্বাগ্রে বীরত্বের চিহ্ন খুঁজে দেখা উচিত। আলমগীর এই উত্তরাধিকারের সর্বাপেক্ষা বড় অংশীদার। তৈমুরের বংশ বাবর থেকে শাজাহান পর্যন্ত শৌর্যবীর্য ও বীরত্বের একটা উৎকৃষ্ট সূচীপত্র। দেখতে পাওয়া যাবে যে, কেউ কারও অপেক্ষা হীন নন। আকবর যুদ্ধরত উন্মত্ত হস্তীর শুঁড় ধারণ করে পশ্চাদপসারণ করে দিয়েছিলন। শাজাহান শাহজাদা অবস্থায় তরবারি দ্বারা বাঘ বধ করেছিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও আলমগীরের ভূমিকা অধিকতর উল্লেখযোগ্য। তাঁর বয়স যখন ৪০ বৎসর মাত্র, তখন একদিন শাজাহান হাতীর লড়াই দেখছিলেন। হঠাৎ একটা হাতী সৈন্য-দলের দিকে ধাওয়া করল। সঙ্গে সঙ্গে সেদিককার দর্শকবৃন্দ দৌড়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু আলমগীর পর্বতবৎ আপন স্থানে অটল ও অচল রইলেন এবং হাতীর সঙ্গে লড়াই শুরু করলেন। হাতী তাঁর ঘোড়াটাকে শুঁড়ের দ্বারা জড়িয়ে ধরে দূরে নিক্ষেপ করল। আলমগীর গড়াগড়ি খেয়ে উঠে পড়লেন এবং বীরের ন্যায় অগ্রসর হয়ে হাতীর উপর তরবারির আঘাত হানলেন। এই লড়াইয়ের কাহিনী সমস্ত ঐতিহাসিকেরা বিস্তারিতভাবে লিখেছেন। শাজাহানের শ্রেষ্ঠ সভা-কবি আবু তালেব কলিম স্বচক্ষে এই দৃশ্য দর্শন করেছেন। তিনি এটাকে কাব্যাকারে প্রকাশ করেছেন। আমি এর কয়েকটা লাইন উদ্ধৃত করছি ঃ

"জ্ঞানীদের শ্রবণেন্দ্রিয়কে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য আমি একটা গল্প বর্ণনা করছি ঃ

এটা আমার লোকমুখে শোনা গল্প নয়, বরং আমি অন্তর দিয়েই শ্রবণ করেছি এবং অন্তর দিয়েই দর্শন করেছি।

এরূপ ঘটনা যখন ঘটে, লোকে একে শাহ্‌নামার কাহিনী বলেই গণ্য করে।

একদিন সকালবেলা জুলুমের অবসানকারী ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ্ আকাশে সূর্যোদয়বৎ আমাদের দর্শন দান করলেন, তাঁর মুখমণ্ডলের উজ্জ্বল আলোকে চন্দ্রের কিরণ নিষ্প্রভ হয়ে গেল।

দর্শকবৃন্দ বাদশার সম্মুখে ভূমি চুম্বন করে আপন আপন আসন গ্রহণ করল।

যুদ্ধ-হস্তীদের লড়াই যখন শুরু হল, তখন যেন কেয়ামত শুরু হয়ে গেল।

জঙ্গী হাতীগুলো যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে একে অপরের প্রতি পতাকাবৎ শুঁড় উত্তোলন করতে লাগল।

অকস্মাৎ সংগ্রামরত ২টা ভয়ানক হাতীর মধ্যে একটা শাহ্জাদা আওরঙ্গজেবের দিকে ধাবিত হল।

বীরবর কিন্তু বিন্দু পরিমাণও পশ্চাদপসরণ করলেন না, এত বড় প্লাবনের মুখে তিনি একটুও নড়লেন না।

তিনি বিদ্যুৎবৎ দ্রুত উজ্জ্বল একটা বল্লম তুলে ধরলেন এবং হাতীর প্রতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন।

তারপর এমন জোরে বল্লম দ্বারা হাতীর ললাটে আঘাত হানলেন যে, তার মুখমণ্ডল থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্তের ধারা প্রবাহিত হল।

ঐ পর্বতপ্রমাণ দেহের মধ্যে বর্শাটা আটকে গেল; আবার লৌহাস্ত্র দ্বারা তাকে আঘাত হানা হল।

হাতী তখন শুঁড় দ্বারা শাহ্জাদার অশ্বটাকে জড়িয়ে ধরল ও দূরে ফেলে দিল।

শাহ্জাদার সওয়ার অবস্থায় হাতী যখন ঘোড়াটাকে ধরে ফেলল, তখন কালের জোহরাতারকা যেন নিদারুণ ভীতিতে গলে পানি হয়ে গেল।

অশ্বটাকে যখন দন্ত দ্বারা আঘাত করল, তখন আকাশ-পাতাল প্রকম্পিত করে বিকট একটা শব্দ উত্থিত হল।

অশ্বটার যখন আর অগ্রসর হবার ক্ষমতা রইল না, তখন তিনি সেখান থেকে বাজপাখীর ন্যায় উড়ে গেলেন।

অশ্বপৃষ্ঠ থেকে মাটিতে অবতরণ করেই তিনি তরবারি ধারণ করলেন। তরবারিটা পতাকাবৎ উড়াতে উড়াতে হাতীর দিকে ছুটে গেলেন ও উন্মত্ত হাতীর সম্মুখে উপনীত হলেন।

এহেন দুঃসাহসের কার্য কারও কাছে বাঞ্ছিত ছিল না, কারণ কারও দেহে তো দুটো প্রাণ নেই!

বীরধর্ম রক্ষার্থে তিনি অগ্রসর হলেন এবং ঐ শত্রু-হাতীটার বিরাট দেহের সম্মুখে পৌঁছে গেলেন।"

শাজাহান এই জীবন-মরণ দৃশ্য স্বচক্ষে অবলোকন করছিলেন। হাতী যখন পশ্চাদপসরণ করল, শাজাহান তখন আলমগীরকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং তার উপর মণিমুক্তা ও টাকার পুষ্পবৃষ্টি বর্ষণ করলেন।

দারাশেকোর সঙ্গে যুদ্ধে আলমগীর মাত্র বিশ-পঁচিশ হাজার সৈন্য নিয়ে একলক্ষ অশ্বারোহী এবং বিশ হাজার পদাতিক সৈন্যের সম্মুখীন হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, যুদ্ধের অবস্থা যখন সঙ্গীন হয়ে পড়ল তখন তাঁর সঙ্গে মাত্র এক হাজার সৈন্য ছিল। সে-সময় তিনি যে বীরত্ব দেখিয়েছিলেন তা লেনপুলের ভাষায় নিম্নরূপ ঃ

"যুদ্ধের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়েছিল এবং আওরঙ্গজেবের পরাজয় আসন্ন হয়ে উঠেছিল। কারণ তাঁর বাছা বাছা অশ্বারোহী দল পশ্চাদপসরণ করে বসেছিল এবং রণাঙ্গনে তিনি একা দণ্ডায়মান ছিলেন। বড়-জোড় এক হাজার সৈন্য তাঁর পশ্চাতে ছিল। তারাও আবার দারাশেকোর আক্রমণ পর্যন্তই অপেক্ষা করছিল। রোস্তমের ন্যায় বিরত্বব্যঞ্জক এরচেয়ে শৌর্যবীর্যের পরীক্ষা আর কোনদিন হয়ত হয়নি; কিন্তু আওরঙ্গজেবের দেহে স্নায়ুগুলো ইস্পাতের তার দিয়ে তৈরী ছিল। সুতরাং একমাত্র তাঁরই বীরত্বের ফলে একলক্ষ সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেও এক হাজার সৈন্যই জয়লাভ করেছিল।"

আলমগীরের এহেন সাহসিকতাপূর্ণ বীরত্ব এবং এহেন আশ্চর্যজনক সঙ্কল্প ও দৃঢ়তাকে তাঁর বার্ধক্য, দুর্বলতা, সফরের ক্লান্তি এবং উপর্যুপরি বিপদাপদ কোন কিছুই ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি। ১১১০ হিজরী তথা ১৬৬৯ খ্রীস্টাব্দে সিতারা মোকামে যখন মারহাট্টারা একটা সুড়ঙ্গ ধ্বংস করে দিল

এবং তার ফলে সৈন্যদের ভিতরে বিপর্যয় দেখা দিল. তখন এই ৮২ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ শাহানশাহ্ তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহন করে ঘটনাস্থলে উপনীত হলেন। মৃতদেহগুলো একস্থানে স্তূপীকৃত করলেন এবং স্থির করলেন যে, তিনি স্বয়ং এই আক্রমণের নেতৃত্ব করবেন। কিন্তু অতি কষ্টে তাঁকে এই সঙ্কল্প থেকে বিরত রাখা হল। এখনও তিনি সেই সমুগড়ের যুবক যিনি স্বহস্তে তাঁর হাতীর পায়ে বেড়ী পরিয়ে দিয়েছিলেন। এটা হচ্ছে লেনপুলের বর্ণনা। খাফী খাঁর বর্ণনা শুনুন ঃ

"সম্রাট যখন জানতে পারলেন যে, দুর্গ আক্রমণকারী সৈন্যবাহিনী সাহস হারিয়ে ফেলেছে, তখন স্বয়ং তিনি ঘোড়ায় চড়ে ঘটনাস্থলে উপনীত হলেন। তিনি মৃতদেহগুলো একত্রিত করতে ও বক্ষস্থলকে তীরের ঢাল-স্বরূপ ব্যবহার করে আক্রমণ চালিয়ে যাওয়ার জন্য অগ্রসর হতে আদেশ দিলেন। সৈন্যদের মধ্যে তাঁর বাণীর প্রতিক্রিয়া যখন তিনি লক্ষ্য করলেন তখন ইচ্ছা করলেন যে, স্বয়ং এই দুর্ধর্ষ যোদ্ধৃবৃন্দের নেতৃত্ব করবেন। অমাত্য-বর্গ বারংবার অনুনয় করে তাঁকে এই সঙ্কল্প থেকে বিরত রাখলেন।"

এটা ঐ সঙ্কট মুহূর্ত ছিল, যখন ঐ সুড়ঙ্গ বিধ্বস্ত হওয়ার ফলে হাজার হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল এবং সৈন্যবাহিনী আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বসেছিল।

আলমগীরের সঙ্কল্প ও দৃঢ়তার চিত্র অসংখ্য স্থানে পরিলক্ষিত হয়। তার মধ্যে এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায় যে, তিনি তখন শাহ্জাদা মাত্র। সে সময় আবদুল আজিজ খাঁর সঙ্গে বল্খের যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। তুমুল যুদ্ধ চলছে। এমন সময় জোহরের নামাজের ওয়াক্ত উপস্থিত হয়। শত্রু-সৈন্য চতুর্দিক থেকে তীর বর্ষণ করেই চলেছিল। কিন্তু ধৈর্যের এই প্রতিমূর্তি তাঁর অশ্বপৃষ্ঠ থেকে একান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে অবতরণ করলেন, নামাজের কাতার কায়েম করলেন এবং নিশ্চিন্ত মনে ফরজ ও নফল নামাজ আদায় করলেন। আবদুল আজিজ খাঁ এই বিস্ময়কর দৃশ্য অবলোকন করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, এরূপ ব্যক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করা তক্দীরের সঙ্গে যুদ্ধ করারই নামান্তর। ('মাসেরে আলমগীরি', পৃঃ ৫৩১)।

এলফিনিস্টন সাহেবের মুখ থেকে আলমগীরের প্রশংসাসূচক একটা কথা বের হওয়াও আলমগীরের সৌভাগ্য ছিল। তা সত্ত্বেও সাহেব প্রবর আলমগীরের দৃঢ়চিত্ততার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে একটা পৃথক অধ্যায় রচনা করেছেন। তিনি বিস্তারিতভাবে এই অধ্যায়টা লিপিবদ্ধ করেছেন এবং বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কায় আমিও তার বিস্তৃত বর্ণনা দিতে ক্ষান্ত রইলাম।

সৈন্যবাহিনীর বীর সৈন্যরূপে দ্বাদশ সৈয়দকে গণনা করা হত। একবার এঁরা সভাষদবর্গের সঙ্গে গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে দিলেন। আলমগীর আদেশ দিলেন, "মোকদ্দমাটা কাজীর কোর্টে পেশ কর।" সৈয়দবৃন্দ বললেন, "তাঁরা নিজেদের বিচার নিজেরাই করবেন, কাজীর দরবারে যাবেন না।" আলমগীর তদুত্তরে আস্তিন গুটিয়ে ক্রোধভরে বললেন, "একবার যারা আমার তরবারির স্বাদ গ্রহণ করেছে তারাই আবার শরীয়তের নির্দেশের বিরুদ্ধে এই রকম মন্তব্য প্রকাশ করতে পারে? তাদের বলে দাও, তারা সকলে মিলিত হয়ে আমার কাছে আসুক।" তারপর তিনি আদেশ দিলেন, "পাহারা প্রভৃতি কার্যে দ্বাদশ সৈয়দবৃন্দের যারাই থাকুক না কেন সকলকেই অপসারিত কর।" এর ফলে সৈয়দদের সমস্ত অহঙ্কার ধূলায় লুণ্ঠিত হল।

শাহ্‌জাদা আকবর যখন বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন এবং ৭০ হাজার রাজপুত সৈন্য সমভিব্যাহারে আলমগীরের নিকটবর্তী হয়ে পড়লেন, তখন তাঁর সঙ্গে মাত্র এক হাজার সৈন্য ছিল। অবশিষ্ট সৈন্যসামন্ত দূর-দূরান্তরে অবস্থান করছিল; কিন্তু এমতাবস্থাতেও আলমগীরের ধৈর্যের ললাট একটুও সঙ্কুচিত হয়নি। অবশেষে শাহ্‌জাদা নিজেই পশ্চাদপসরণ করে রণে ভঙ্গ দিলেন।

শাহ্‌জাদা আজম শাহ্ যাঁর বীরত্ব ও বাহাদুরীর খ্যাতি সমগ্র সাম্রাজ্যে বিস্তৃত ছিল, তাঁর সঙ্গে যে ঘটনা ঘটেছিল তা সর্বজনবিদিত। এরই পরিণাম-স্বরূপ দেখা গিয়েছে যে, যখনই আলমগীরের পত্র তাঁর কাছে পৌঁছত, তখনই তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেত। এই ধরনের এত সব ঘটনা রয়েছে যে, তার সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করা একান্তই কঠিন।

তরবারি ও লেখনী উভয়ের উপরেই আলমগীরের প্রভুত্ব ছিল। তাঁর রচনা-শক্তির প্রশংসা তাঁর শত্রুদের মুখেও প্রচারিত হয়েছে। তাঁর পত্রাবলী

যদিও ঘটনাপুঞ্জীর সমাবেশ, উদ্ধৃত কাহিনীর সমষ্টি এবং ভৌগোলিক বৃত্তান্তের স্মারকলিপি, তথাপি প্রকাশভঙ্গির দক্ষতা, ভাষার প্রাঞ্জলতা, চমৎকার বাক্য-বিন্যাস, সংক্ষেপে ভাবোদ্ধার, বাক্যাবলীর ঘন সন্নিবেশ এবং মনোরম শব্দ-যোজনা অত্যন্ত বিস্ময়কর। এমনকি উর্দু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনা শিল্পী মৌলভী মোহাম্মদ হুসায়েন আজাদকেও নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রশংসাসূচক কয়েকটা কথা লিখতে হয়েছে :

"আলমগীর সরল অন্তঃকরণ পেয়েছিলেন এবং অদ্ভুত বর্ণনাশক্তিসম্পন্ন কণ্ঠ লাভ করেছিলেন। এর কারণ হল, ফরমান ও পত্রাদি তিনি নিজেই লিখতেন অথবা সম্মুখে বসিয়ে লিখাতেন। দলিলপত্র কাগজাদির উপরে নিজেই নির্দেশ দান করতেন। তিনি ৫০ বৎসর রাজত্ব করবার পর ১১১৮ হিজরীতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর রচনাবলী পাঠে অবাক হতে হয় যে, তিনি যেভাবে সাম্রাজ্যের সিংহাসনকে করতলগত করে রেখেছিলেন তেমনিভাবে সাহিত্য-রাজ্যকেও তাঁর লেখনীর আয়ত্তে রেখেছিলেন। দেখুন, তাঁর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্যগুলি রাষ্ট্র পরিচালনার কৌশলে সুসজ্জিত, তাঁর ভাষা পরিষ্কার এবং শব্দগুলো 'ব্যবহারিক প্রয়োগে' যেন লবণের মিশ্রণ দ্বারা মধুর করে তুলেছেন। তাঁর রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনার নির্দেশ ও উপদেশ এবং অধিকাংশ চরিত্রগত নসিহত সমস্তই প্রতিক্রিয়ায় ভরপুর। তাঁর রচনাবলী ফুলবাগানের সঙ্গে তুলনা করলে কিছুই অশোভন হবে না। পার্থক্য শুধু এইটুকু যে, বাগানের রচনাবলী কাল্পনিক, পক্ষান্তরে তাঁর রচনাবলী স্বাভাবিক অবস্থার অভিব্যক্তি। তাঁর বাক্যাবলী পড়তে যতই সহজ লিখতে ততই কঠিন।"

আলমগীরের পত্রাবলীতে তাঁর রচনা-নিপুণতার কথা বাদ দিলেও তাঁর বিরাট পাণ্ডিত্য, ধর্মীয় জ্ঞানের গভীরতা, আধুনিক বার্তাবিজ্ঞতা, স্বভাবজাত হাস্যরসিকতা এবং নির্ভুল নির্বাচনী ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।

আলমগীরের চরিত্র ও প্রকৃতি যথাক্রমে অত্যন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ ও অবিচল ছিল। অসংলগ্ন কথা কোন সময়েই তাঁর মুখ থেকে বের হয়নি। তিনি অত্যন্ত দয়ালু ও উদারনৈতিক ছিলেন। গুণী ব্যক্তিদের সমাদর করতেন। জনসাধারণের প্রতি যথোচিত সৌজন্য প্রদর্শন করতেন। তিনি নিজে একটা

নীরস তাপস-জীবন যাপন করতেন। নাচগান ইত্যাদি খেলাধূলার আলোচনা একান্তভাবেই পরিহার করতেন। অথচ আশ্চর্যের কথা, এহেন গুণী ব্যক্তি ততখানি কৃতকার্য হতে পারেননি, যতখানি তার হওয়া উচিত ছিল। এর কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় :

১। তাঁর উপযুক্ত সন্তান ছিল না। তাঁর স্থলাভিষিক্ত বাহাদুর শাহ্ দুপুরবেলা পর্যন্ত ঘুমাতেন। এতেই তাঁর অপরাপর গুণাবলীর পরিচয় পাওয়া যায়।

২। এই সমস্ত গুণ থাকা সত্ত্বেও তাঁর একটা গুরুতর দোষ ছিল। তিনি স্বীয় বীরত্ব ও দৃঢ়তা হেতু কাউকেই বিশ্বাস করতে পারেননি। সেহেতু কাউকে বন্ধুরূপে গড়ে তুলতেও পারেননি।

৩। মারহাট্টাদের দমনকার্যে তিনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত শক্তি ব্যয় করেছিলেন।

৪। স্বভাবের দিক দিয়ে তিনি অত্যন্ত মিতব্যয়ী ছিলেন। হজরত উমর ফারুকের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির পক্ষে চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য হয়ত উপযোগী হতে পারত, কিন্তু শাজাহানের পরিত্যক্ত সিংহাসনে উপবেশনকারীর পক্ষে এটা শোভনীয় ছিল না।

মোটকথা, আলমগীরের যে চরিত্র-চিত্র বিরোধী দল কর্তৃক অঙ্কিত হয়েছে তা সম্পূর্ণ বিদ্বেষদুষ্ট ও শত্রুতার রঙে রঙীন। কিন্তু তাই বলে তিনি মানবীয় দুর্বলতার উর্ধ্বে ছিলেন একথা বলাও অতিরঞ্জিত হবে। এই সমস্ত গুণে গুণান্বিত থাকা সত্ত্বেও তৈমুরী বাদশাহ্‌দের তালিকায় আমি তাঁকে সেই স্থানই দান করতে পারি, ক্রমিক পর্যায়ে যা তাঁর প্রাপ্য। তবু স্বীকার করতেই হবে যে, গোটা মুসলিম জগতে আজ পর্যন্ত তাঁর সমকক্ষ ব্যক্তি কেউই জন্মগ্রহণ করেননি।